সাংখ্য পরিচয়

'গীতায় ঈশ্বরবাদ', 'কর্মবাদ ও জন্মান্তর', 'প্রেমধর্ম'

প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্, বেদান্তরত্ন

প্রণীত

সন ১৩৪৬ সাল

[মূল্য ১৷৹

প্রকাশক :

শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্ত

১৩৯-বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীভোলানাথ মি

অরুণ্যান প্রেস

২৪, কালী দত্ত ষ্ট্রীট, কলিক

বিজ্ঞপ্তি

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে আমি সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে এক বিস্তৃত গ্রন্থরচনায় সংকল্প করিয়া, বক্তব্য বিষয়ের একটি চুম্বক প্রস্তুত করি. কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ চুম্বক খসড়ারূপ জ্রূণেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ হওয়া বিচিত্র নয়, কারণ প্রাচীন প্রবচন আছে—উৎথায় হৃদি লীয়ন্তে উকীলানাং মনোরথাঃ। পরে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আহ্বানে পরিষদ্-মন্দিরে সাংখ্য-সম্পর্কে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিই এবং ঐ সকল মৌখিক বক্তৃতার নোট অবলম্বনে বারটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া ১৩৩০-৩৩ সনের 'ব্রহ্মবিদ্যা'য় ক্রমশঃ প্রকাশিত করি। ঐ প্রবন্ধ-ধারার নামকরণ করিয়াছিলাম—'সাংখ্য-পরিচয়' (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়ে'র অনুকরণে); কারণ, ঐ প্রবন্ধাবলী আদৌ পাণ্ডিত্য-বিজৃম্ভিত ছিল না, উহা দ্বারা সাধারণ শিক্ষিত পাঠক সাংখ্য-জ্ঞানের সহিত পরিচয় লাভ করিবেন, ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুতঃ সাহিত্য পরিষদে আমি যে ধারা-বাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলাম, তাহা Extension Lectures (জ্ঞান-বিস্তারী বক্তৃতা) ধরণের ছিল। পরিষৎ বিদ্বৎ-সমাজ হইলেও আমার বক্তৃতা যাহাতে সাধারণ শ্রোতা,—পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেরই বোধগম্য হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলাম; ঐ প্রবন্ধ-ধারারও আমার সেইরূপ চেষ্টা ছিল। ঐরূপ করাই আমার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। কারণ, আমি নিজে পাণ্ডিত্য-বিবর্জিত। সেই জন্য উপনিষদের নিম্নোক্ত বাণীটি আমার বড় প্রিয়—

তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ—বৃহদারণ্যক

'অতএব পাণ্ডিত্য হইতে নির্বিন্ন হইয়া বালকভাবে অবস্থান করিবে।' শিশুখৃষ্টের মুখেও আমরা ঐ ধরণের কথা শুনিয়াছি—

দাও ক্ষুদ্র শিশুদের আসিতে নিকটে মম।

স্বর্গরাজ্য তাহাদের—যারা ক্ষুদ্র শিশু সম॥

সেই জন্য জ্ঞানগর্বিত পাশ্চাত্যেরাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, পাণ্ডিত্যের বিজৃম্ভনা মানুষকে মত্ত করে মাত্র।* এ কথা অসঙ্গত নয়—কারণ, আর্য সত্য (Ultimate Truth) আয়ত্ত করিতে হইলে, মনন ও নিধিধ্যাসন আবশ্যক—তজ্জন্য ধ্যানী ও সমাহিত হওয়া চাই। তত্ত্বের মর্মস্থানে প্রবেশ করিতে হইলে, পাণ্ডিত্যের সম্বল যে বুদ্ধি, তাহাকে নহে—ধ্যানের পরিপাক যে বোধি—তাহাকেই পাথেয় করিতে হয়।

উক্ত প্রবন্ধাবলী পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া, এবং বহু স্থানে পুনর্লিখিত হইয়া, এখন 'সাংখ্য পরিচয়'-গ্রন্থরূপে প্রচারিত হইল।

পুরুষ ও প্রকৃতি লইয়া সাংখ্যতত্ত্ব। সাংখ্য পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে পুরুষতত্ত্বের বিবরণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকৃতিতত্ত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উপক্রম অবতরণিকা-স্বরূপ—উহাতে সাংখ্যতত্ত্বের সাধারণ কথা বিবৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডভুক্ত কয়েকটি প্রবন্ধ ইতিপূর্বে 'পরিচয়' মাসিক পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।

১০ই বৈশাখ
১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

---

* Much learning hath made thee mad.

সূচীপত্র

উপক্রম

প্রথম অধ্যায়

সাংখ্য নামের নিরুক্তি

মহাভারত-কার 'শান্তিপর্বে' মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—নাস্তি সাংখ্য-সমং জ্ঞানম্। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন—তৎকারণং সাংখ্য-যোগাধিগম্যম্—'সেই পরমকারণ সাংখ্য-যোগের অধিগম্য'। এমন কি, দেখা যায় প্রাচীন ভারতে সাংখ্য ও জ্ঞান পর্যায়-শব্দ (convertible terms))-রূপে ব্যবহৃত হইত। তাই ভগবদ্গীতায় জ্ঞান-যোগের নাম 'সাংখ্য'—

জ্ঞান-যোগেন সাংখ্যানাম্—গীতা, ৩।৩

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানম্—গীতা ৫।৫

এবং গীতা সাংখ্যকে 'কৃতান্ত' অর্থাৎ সিদ্ধান্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন—

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি—গীতা, ১৮।১৩

অতএব সাংখ্য শাস্ত্রের আলোচনার বিশেষ উপযোগিতা আছে।

সাংখ্যকে 'সাংখ্য' বলে কেন? সাংখ্য-নামের সার্থকতা কি? সাংখ্য-শব্দের নিরুক্তি (etymology) কি?

সং পূর্বক 'খ্যা' ধাতু হইতে 'সংখ্যা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সংখ্যা' হইতে 'সাংখ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি। ঐ সংখ্যা শব্দের অর্থ কি?

সংখ্যা শব্দের প্রচলিত অর্থ Number—এক, দুই, তিন, চার প্রভৃতি গণনা। যে শাস্ত্রে তত্ত্বসকলের সংখ্যা বা গণনা করা হয়, তাহার নাম সাংখ্য। ইহাই সাংখ্য নামের প্রচলিত ব্যুৎপত্তি।

সাংখ্যং সংখ্যাত্মকত্বাচ্চ কপিলাদিভি রুচ্যতে—মৎস্যপুরাণ, ৩।২৬

মহাভারতেও এই মতের সমর্থন দেখা যায়—

সংখ্যাং প্রকুর্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।

তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশং তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥—শান্তিপর্ব

অর্থাৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা করে বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রের নাম 'সাংখ্য'। *

বস্তুতঃ তত্ত্বসমাসে আমরা এই দুইটি সূত্রের সাক্ষাৎ পাই—অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ—প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র এই আটটি প্রকৃতি এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চস্থূলভূত এই ষোড়শ বিকার—উভয়ে মিলিয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্ব; ইহার উপর পুরুষ—তাহাকে গণনা করিলে তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি হয়।† এই পঞ্চবিংশতি গণনা লক্ষ্য করিয়া গৌড়পাদধৃত একটি প্রাচীন বচন আমরা প্রাপ্ত হই।

---

* ইহার অনুসরণ করিয়া অধ্যাপক হোরেশ উইল্‌সন্‌ লিখিয়াছেন—

The 'Sankhya' philosophy is so termed, because it observes precision of reckoning in the enumeration of its principles, 'Saukya' being understood to signify 'numeral', agreeable to the usual acceptance of সংখ্যা (number).

† ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার কারিকায় পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের এইরূপ গণনা করিয়াছেন :—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।

ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥—সাংখ্যকারিকা, ৩

সাংখ্যসূত্রের গণনা এইরূপ :—

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্‌ মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ

—সাংখ্যসূত্র ১।৬১

অর্থাৎ, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ— এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা মূল প্রকৃতি, তাহার বিকার মহৎতত্ত্ব, মহতের বিকার অহঙ্কার-তত্ত্ব, অহঙ্কারের বিকার পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের বিকার পঞ্চ মহাভূত; আর পুরুষ—এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ।
জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ যিনি পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বজ্ঞ, তিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারী হউন, গৃহস্থ হউন, বানপ্রস্থী হউন অথবা সন্ন্যাসী হউন—তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত।

কিন্তু 'সংখ্যা' শব্দের আর একটি অর্থ আছে—সে অর্থ জ্ঞান বা বিচারণা।

সংখ্যা সম্যক্ বিবেকেন আত্মকথনম্ (বিজ্ঞানভিক্ষু)

যথা মহাভারতে—

যো বেত্তি সংখ্যাং নিয়তৌ বিধিজ্ঞঃ—১২।৫৭।৭

'খ্যা' ধাতুর এই অর্থ হইতে প্রাচীন খ্যাতি শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। এখন 'খ্যাতি' বলিলে, আমরা সুখ্যাতি বা অখ্যাতি বুঝি; কিন্তু প্রাচীন কালে খ্যাতির অর্থ ছিল জ্ঞান বা বিবেক। পঞ্চশিখের একটি সূত্র আছে—একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্। পাতঞ্জল দর্শনেও আছে—বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা হানোপায়ঃ—যোগসূত্র ২।২৭। ইহা হইতে দর্শনের পরিভাষায় সুপ্রচলিত 'অন্যথা খ্যাতি' শব্দ। সেখানেও খ্যাতিশব্দে বুদ্ধি বা বিবেক।

'সংখ্যা' শব্দের সমানার্থক 'সংখ্যান' শব্দেরও বুদ্ধি বা বিবেক অর্থে অনেক স্থলে প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন ভগবদ্গীতায়—

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে—১৮।১৯

অথবা ভাগবতে—

নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্বগুণসংখ্যানায় *—৫।১৭।১৭

এই বুদ্ধি বা বিবেককে 'সংখ্যা' না বলিয়া, কোথায় কোথায় 'প্রখ্যা' বলা হইয়াছে; যেমন যোগসূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে—

চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণং

* * তৎপরং প্রসংখ্যানম্ ইত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ—ব্যাসভাষ্য।

---

* সর্বেষাং গুণানাং সংখ্যানং প্রকাশো যস্মাৎ ইতি শ্রীধরস্বামী।

প্র ও সং মিলাইয়া ঐ 'প্রসংখ্যান' শব্দ। উহারও অর্থ বিচার বা বিবেক।

প্রসংখ্যানেঽপি অকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতেঃ ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ

—যোগসূত্র, ৪।২৯

শ্রীধরস্বামী বলেন, যে সংখ্যা শব্দ হইতে সাংখ্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার অর্থ সম্যক্ জ্ঞান এবং যে শাস্ত্রে এই সম্যক্ জ্ঞান প্রকাশিত বা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারই নাম সাংখ্য।

সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বম্ অনয়া ইতি সংখ্যা সম্যক্‌জ্ঞানং ; তস্যাং প্রকাশমানম্ আত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্—গীতার ২।২৯ শ্লোকের শ্রীধরভাষ্য।

মহাভারতে এই মতের অনুমোদন আছে—

সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যান-দর্শনম্।

শ্রীধর স্বামীর মতই যুক্ততর মনে হয়। অতএব 'সাংখ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি—গণনার্থ সংখ্যা শব্দ হইতে নহে—ইহার নিরুক্তি বিবেকার্থ সংখ্যা শব্দ হইতে।

——

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্য গ্রন্থের স্বল্পতা

সাংখ্য তত্ত্বের যথোচিত আলোচনার প্রধান অন্তরায় প্রামাণিক গ্রন্থের স্বল্পতা (paucity of materials)। বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ে যেরূপ উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও তাহার বহুবিধ ভাষ্য, গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, পঞ্চদশী, এবং শত শত নিবন্ধগ্রন্থ প্রচলিত আছে, সাংখ্যবিষয়ে সেরূপ নহে। তত্ত্বসমাসসূত্র, সাংখ্যপ্রবচনসূত্র এবং ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা—এই তিন খানি গ্রন্থের উল্লেখ করিলেই সাংখ্যমতের মূল গ্রন্থের গণনা শেষ হইল। এই তিনের মধ্যে তত্ত্বসমাসসূত্রই প্রাচীনতম। ইহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। অনেকে ইহাকে সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্তক কপিল ঋষির মূল দর্শন মনে করেন। ইহাকে কিন্তু দর্শনগ্রন্থ না বলিয়া দর্শনের সূচীপত্র বা বিষয়তালিকা বলিলেই ঠিক্ হয়। তত্ত্বসমাসের কয়েকটী সূত্র এইরূপ—পুরুষঃ, ত্রৈগুণ্যং, সঞ্চরঃ, প্রতিসঞ্চরঃ, অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ, ষোড়শ বিকারাঃ ইত্যাদি। এই তত্ত্বসমাসের কপিলশিষ্য আসুরির নামে প্রচলিত এক উপাদেয় ভাষ্য এবং ১৭৯৩ শকাব্দে লিখিত ভূদেব শ্রীনরেন্দ্র-কৃত এক টীকা প্রচলিত আছে।

সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত বিস্তৃত সূত্র-গ্রন্থ। প্রচলিত মত এই যে, ইহাই কপিলঋষির মূল সূত্র। এ সম্বন্ধে সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন—শ্রুত্যবিরোধিনীঃ উপপত্তীঃ ষড়ধ্যায়ীরূপেণ বিবেকশাস্ত্রেণ কপিলমূর্তি র্ভগবান্ উপদিদেশ।

একই কপিলঋষি যদি তত্ত্বসমাস ও প্রবচনসূত্র—উভয় গ্রন্থই রচনা করিয়া থাকেন, তবে ত' পৌনরুক্ত্য হইল? এই আপত্তির নিরাস জন্য বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিতেছেন—নম্বেবমপি তত্ত্বসমাসাখ্যসূত্রৈঃ সহ অস্যাঃ

ষড়ধ্যায়্যাঃ পৌনরুক্ত্যম্ ইতি চেৎ মৈবং সংক্ষেপ-বিস্তররূপেণ উভয়োরপি অপৌনরুক্ত্যাৎ।

অর্থাৎ কপিলঋষি তত্ত্বসমাসে যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন, প্রবচনসূত্রে তাহারই বিস্তার করিয়াছেন—অতএব প্রবচনসূত্রকে তত্ত্বসমাসের পুনরুক্তি বলা যায় না। বিজ্ঞানভিক্ষুর এই মত যুক্তিসঙ্গত কিনা আমরা ক্রমশঃ তাহার বিচার করিব।

এই প্রবচন-সূত্রের অনিরুদ্ধকৃত বৃত্তি ও বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্য প্রচলিত আছে।

অনিরুদ্ধ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের ও বিজ্ঞানভিক্ষু ষোড়শ শতকের লোক।

সাংখ্য মতের বিবরণ করিয়া পঞ্চশিখাচার্য ষষ্টিতন্ত্র নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।* সেই গ্রন্থ এখন লুপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা—ইতিপূর্বে আমরা যাহার নামোল্লেখ করিয়াছি—ঐ কারিকা-গ্রন্থ পঞ্চশিখের ষষ্টিতন্ত্র অবলম্বনে রচিত। সাখ্যকারিকা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ—উহাতে আর্যাছন্দোনিবদ্ধ মাত্র ৭০টী শ্লোক আছে। গ্রন্থকার ঈশ্বরকৃষ্ণ গ্রন্থের শেষে বলিতেছেন—

সপ্তত্যাঃ কিল যেঽর্থা স্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাদ-বিবর্জিতাশ্চ॥

অর্থাৎ 'ষষ্টিতন্ত্র গ্রন্থে যে অর্থ বিবৃত হইয়াছে, আমি এই ৭০টী শ্লোকে সেই অর্থই প্রকাশিত করিলাম। তবে ষষ্টিতন্ত্রে আখ্যায়িকা ও পরবাদ আছে, আমার গ্রন্থে তাহা নিবদ্ধ হইল না।'

এই কারিকার গৌড়পাদকৃত প্রামাণিক ভাষ্য ও বাচস্পতিমিশ্র-কৃত 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' নামক উপাদেয় টীকা প্রচলিত আছে। বাচস্পতি মিশ্র

---

* কেহ কেহ বলেন ষষ্টিতন্ত্রের প্রণেতা বার্ষগণ্য। এ মত ভিত্তিহীন। আরও দেখা যায়—A Chinese tradition attributes the authorship of ষষ্টিতন্ত্র to পঞ্চশিখ।

ষড়্‌দর্শনের টীকাকার—নবম শতাব্দীর লোক। তাঁহার তুল্য দার্শনিক আধুনিক কালে সুদুর্লভ। গৌড়পাদ শ্রীশঙ্করাচার্যের গুরুর গুরু—শঙ্করের গুরু গোবিন্দের গুরু। তাঁহার আবির্ভাবকাল বোধ হয় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। কারিকার আর একখানি প্রাচীন ভাষ্য আছে—তাহার নাম মাঠরবৃত্তি। সম্ভবতঃ এ বৃত্তি গৌড়পাদকৃত ভাষ্য হইতে প্রাচীনতর।

ইহা ছাড়া সাংখ্যকারিকার আর দুইটি টীকা আছে– নারায়ণ তীর্থের সাংখ্যচন্দ্রিকা এবং রামকৃষ্ণের সাংখ্যকৌমুদী। সাংখ্যকৌমুদীতে সাংখ্যচন্দ্রিকার প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ—অতএব রামকৃষ্ণকে টীকা প্রণয়নে কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত সাংখ্যসারের উল্লেখ করিলেই সাংখ্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থতালিকা সম্পূর্ণ হয়।

যোগদর্শন সাংখ্যের সজাতীয় দর্শন—কারণ, পতঞ্জলির যোগসূত্রের তত্ত্বাংশে সাংখ্যমত অঙ্গীকৃত হইয়াছে এবং কপিল দর্শনের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সমর্থিত হইয়াছে। পতঞ্জলি ঐ ২৪ তত্ত্বের বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন :—

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি —২।১৯

অলিঙ্গ—(মূলপ্রকৃতি), লিঙ্গমাত্র (মহৎতত্ত্ব), অবিশেষ (অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র) এবং বিশেষ (ষোড়শ বিকার)—ত্রৈগুণ্য বা প্রকৃতির এই চারি পর্ব।

সেই জন্য ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্যমতের নিরাস করিয়া সূত্রকার লিখিয়াছেন—অনেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ অর্থাৎ ইহার দ্বারা যোগদর্শনও নিরাকৃত হইল। এইরূপ বলিবার তাৎপর্য এই যে, যোগদর্শনে যখন সাংখ্যোক্ত পদার্থাবলিই স্বীকৃত হইয়াছে, তখন সাংখ্যনিরাস দ্বারাই পাতঞ্জলও নিরাকৃত হইল। ঐ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,—এতেন সাংখ্যস্মৃতি-প্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যা ইত্যতিদিশতি। তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং, মহদাদীনি চ কার্যানি অলোক-

বেদপ্রসিদ্ধানি কল্প্যন্তে। অতএব সাংখ্য-তত্ত্বের আলোচনায় পাতঞ্জলসূত্রের সাহায্য উপেক্ষণীয় নহে।

যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য নামে এক প্রাচীন ও প্রামাণিক ভাষ্য প্রচলিত আছে। এই ভাষ্যের উপরই বাচস্পতি মিশ্র 'তত্ত্ববৈশারদী' নামে ও বিজ্ঞান-ভিক্ষু 'যোগবার্তিক' নামে টীকা রচনা করিয়াছেন। পাতঞ্জল-সূত্রের ভোজদেব-কৃত বৃত্তি ঐ ব্যাসভাষ্যেরই সংক্ষিপ্তসার।

পঞ্চশিখের ষষ্ঠিতন্ত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বেও দার্শনিক-সমাজে প্রচলিত ছিল। কারণ, দেখা যায় গৌড়পাদাচার্য ১৭তম কারিকার ভাষ্যে পঞ্চশিখের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—তথাচ পঞ্চশিখঃ পুরুষাধিষ্ঠিতং প্রধানং প্রবর্ততে। তৎপূর্ববর্তী ব্যাসভাষ্যেও প্রমাণস্বরূপ ষষ্ঠিতন্ত্র হইতে ১০।১২টি বচন উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়। তথাচ সূত্রং একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্। বাচস্পতি মিশ্র ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—পঞ্চশিখাচার্যস্য সূত্রং একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্। এইরূপ ২।৫ সূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—তদৈতদ্ অত্রোক্তং ব্যক্তম্ অব্যক্তমেব বা সত্ত্বম্ ইত্যাদি। ইহার টীকাতেও বাচস্পতি বলিয়াছেন—উক্তং পঞ্চশিখেন। এইরূপ ২।৬, ২।১৩, ২।১৭, ২।১৮ প্রভৃতি সূত্রেও ষষ্ঠিতন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষুও ১।১২৭ সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে পঞ্চশিখের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—অত্র আদিশব্দগ্রাহ্যাঃ পঞ্চশিখাচার্যৈরুক্তা, যথা সত্ত্বং নাম প্রকাশ-লাঘবাভিষঙ্গ ইত্যাদি। বিজ্ঞানভিক্ষু খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক—দেখা যাইতেছে তাঁহার সময়েও পঞ্চশিখের গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক কীথ বলেন,—জৈন 'অনুযোগদ্বার' সূত্রে ষষ্ঠিতন্ত্রের উল্লেখ আছে এবং অহির্বুধ্ন্যসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে সাংখ্যের পরিচয়ে যে বলা হইয়াছে—It is a theistic system of 60 divisions in two parts of 32 (Prakriti) and 28 (Vikriti)—তদ্ দ্বারা নিঃসংশয়ে 'ষষ্টিতন্ত্র' লক্ষিত হইতেছে। অতএব আশা হয়, হয়ত এখনও কোন পুঁথিশালার কীটদষ্ট

স্তূপের মধ্যে ষষ্টিতন্ত্র প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং কালে হয়ত হঠাৎ একদিন উহা আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। যদি কোন দিন ঐরূপ হয়, তবে সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনায় সেদিন নবযুগের সূত্রপাত হইবে। কারণ, খুব সম্ভব প্রবচনসূত্র মূল কাপিল দর্শন নহে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে পঞ্চশিখের ষষ্টিতন্ত্রের মূল্য অত্যধিক। সাংখ্য-পরম্পরা (tradition) এই যে, মহর্ষি কপিল এই সাংখ্যশাস্ত্র তাঁহার শিষ্য আসুরিকে প্রদান করেন এবং আসুরি পঞ্চশিখকে প্রদান করেন; আর পঞ্চশিখই এই সাংখ্যশাস্ত্রের বিস্তার করেন—তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্।

আমরা বলিয়াছি যে, খুব সম্ভব প্রচলিত সাংখ্যপ্রবচনসূত্র মূল কাপিল দর্শন নহে।* এ মত বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতের বিপরীত; কারণ, আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার মতে এই ষড়ধ্যায়ী সূত্র কপিলমূর্তিঃ ভগবান্ উপদিদেশ। অথচ বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার ভাষ্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন—'কালরূপ রাহু সাংখ্য-চন্দ্রকে ভক্ষণ করিয়াছে, এখন আমি বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা তাহার পূরণ করিতেছি।'

কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যং * * পূরয়িষ্যে বচোমৃতৈঃ।

প্রবচনসূত্রকে যাঁহারা মূল কাপিল দর্শন বলিতে চান, তাঁহাদিগকে কয়েকটী আপত্তির মীমাংসা করিতে বলি।

(ক) প্রবচনসূত্র যদি কপিল-প্রণীত হয়, তবে তাহার মধ্যে পঞ্চশিখ, সনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী সাংখ্যাচার্যদিগের মত কিরূপে উদ্ধৃত হইল?

আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ—৫।৩২

অবিবেক-নিমিত্তো বা পঞ্চশিখঃ—৬।৬৮

লিঙ্গশরীর-নিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্যঃ—৬।৬৯

লয়বিক্ষেপয়ো র্ব্যাবৃত্ত্যা ইত্যাচার্যাঃ—৬।৭০

---

* ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের মতে সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের বয়স মাত্র ৫০০ বৎসর—'It probably belongs to the 14th century.'

সংহতপরার্থত্বাৎ॥ ত্রিগুণাদি বিপর্যয়াৎ॥ অধিষ্ঠানাচ্চেতি॥ ভোক্তৃভাবাৎ॥ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥

পঞ্চদশ কারিকাটি এইরূপ :—

ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্যবিভাগাৎঅবিভাগাদ্বৈশ্বরূপস্য॥

ইহার সহিত ১।১২৯-৩২ সাংখ্যসূত্র তুলনীয়। উভয়ান্যত্বাৎ কার্যত্বং মহদাদেঃ ঘটাদিবৎ॥ পরিমাণাৎ॥ সমন্বয়াৎ॥ শক্তিতশ্চেতি॥

অতএব দাঁড়াইল যে, সাংখ্যমতের বিবরণ করিবার জন্য সাংখ্যদর্শনের সূচিপত্রস্থানীয় তত্ত্বসমাস এবং এই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন প্রবচনসূত্র ব্যতীত একমাত্র ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকার উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। সেই জন্যই বলিয়াছি যে, সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনার প্রধান অন্তরায় প্রামাণিক গ্রন্থের অল্পতা।

কিন্তু অল্প গ্রন্থের সাহায্যেও যে আলোচনা সম্ভবপর ছিল, দুঃখের বিষয় আমাদের এই বঙ্গদেশে ন্যায়, স্মৃতি ও তন্ত্রের অত্যধিক চর্চায় সেটুকু চর্চাও বিরল হইয়াছিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পূর্বতন অধ্যক্ষ হোরেশ উইল্‌সন্ সাহেব ১৮৩১ সালের ১লা জুলাই সাংখ্যতত্ত্বালোচনা-প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, 'বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণকে সাংখ্যমতের অল্পই আলোচনা করিতে দেখা যায়। আমি অনেক পণ্ডিতেরই সংস্পর্শে আসিয়াছি কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মাত্র একজনই সাংখ্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন।'*

---

* The subject indeed is little cultivated by the pandits and during the whole of my intercourse with learned natives I met with but one Brahmin who professed to be acquainted with the writings of this school.

উইল্‌সন্ সাহেব অন্তরে সদাশয় লোক ছিলেন—পাশ্চাত্যসুলভ বিদ্যাভিমান ও অহংকার-কীর্তি তাঁহাতে আদৌ ছিল না। তিনি এ দেশের পণ্ডিতের মর্যাদা বুঝিতেন

সুখের বিষয় এখন বাঙ্গালাদেশে অনেক সাংখ্যতীর্থের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে। ইংরাজি-শিক্ষিতদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সাংখ্যদর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমার যতদূর জানা আছে—ইহার প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনিই প্রথম সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া ইংরাজি শিক্ষিতদিগের এ সম্বন্ধে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাহার পূর্ব্বেই কিন্তু পশ্চিম দেশে এ বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল—সে কথা পরে বলিতেছি। ইহার পর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় তত্ত্ব সভা হইতে দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী উইল্সন্ সাহেবের প্রকাশিত সাংখ্যকারিকা ও গৌড়পাদ-ভাষ্য অবলম্বন করিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। বোধ হয় এই সময়েই পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত সাংখ্যসূত্রের অনিরুদ্ধবৃত্তি প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত সানুবাদ সাংখ্যসূত্র ও বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্যও উল্লেখযোগ্য। ইহার অনেক পরে পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু মহাশয়ের গ্রন্থও উল্লেখ করার যোগ্য। ইহার কিছুদিন পরে স্বর্গগত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় 'নব্যভারতে' সাংখ্যপ্রবচন-সূত্রের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। মৎপ্রণীত 'গীতায় ঈশ্বরবাদে' আমিও সাংখ্যদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য সকলের সন্নিবেশ ও সমালোচনা করিয়াছিলাম।

এবং তাঁহাদের নিকট নিজ ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—
It is the fashion with some of the most distinguished Sanskrit scholars on the continent to speak slightingly of native Scholists and Pandits * * Without therefore in the least degree undervaluing European industry and ability, I cannot consent to hold in less esteem the attainments of my former masters and friends, the Sanskrit learning of learned Brahmans .

যে সকল বাঙ্গালী সাংখ্যতত্ত্ব-প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিবেণীতে প্রতিষ্ঠিত কপিলাশ্রমের শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ আরণ্য ও হরিহরানন্দ স্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচার করিয়া এবং যোগ-দর্শনের ব্যাসভাষ্য-সম্বলিত এক সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করিয়া ইঁহারা দর্শনামোদী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বঙ্গের বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী সাংখ্যদর্শনের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল সিংহের নাম গণনীয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাংখ্যকারিকার সভাষ্য অনুবাদ প্রচার করিয়া এবং সিংহ মহোদয় প্রয়াগ হইতে প্রকাশিত 'Sacred Books of the Hindus' শ্রেণীগ্রন্থে প্রবচন-সূত্রের ইংরাজি অনুবাদ (বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য ও অনিরুদ্ধ-কৃত বৃত্তি সমেত) এবং নরেন্দ্র-কৃত টীকার সহিত তত্ত্বসমাস সূত্রের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়া প্রশংসার্হ হইয়াছেন। এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা মহাশয়ের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর ইংরাজি অনুবাদও উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু ইহার বহুপূর্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেখা যায়, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হেন্‌রি টমাস্ কোলব্রুক্ Transactions of the Royal Asiatic Societyতে সাংখ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইয়ুরোপে বোধ হয় এই প্রথম সাংখ্যালোকের প্রবেশ। কোলব্রুক্ অতি ধীর, মনীষী ব্যক্তি ছিলেন। অধ্যাপক গোল্ডষ্টকর তাঁহাকে প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ্‌গণের প্রধান (Prince of Orientalists) বলিয়াছেন। এ বর্ণনা অত্যুক্তি নহে। তাঁহার আলোচনার ফলে সাংখ্যমত অনেকাংশে বিশদ হইয়াছিল। তিনি সাংখ্যকারিকার মূল ও ইংরাজি অনুবাদ সম্পাদন করিয়া প্রকাশার্থ প্রস্তুত করেন, কিন্তু অকাল মৃত্যুর জন্য ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮৩৭

খৃষ্টাব্দে হোরেশ উইল্‌সন্‌ সাহেব নিজ টিপ্পনী সহ ঐ গ্রন্থ প্রচার করেন। ইতিমধ্যে কিন্তু ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক লাসেন্‌ (Lassen) সাংখ্যকারিকার মূল ও লাটিন অনুবাদ জার্মানিতে এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক পান্‌থিয়র (Pantheir) প্যারিসে রোমান অক্ষরে কারিকা ও তাহার ফরাশি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখনও প্রবচন-সূত্র ইয়ুরোপে অপরিজ্ঞাত ছিল। ১৮৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে হল্‌ (Hall) বিজ্ঞান-ভিক্ষুর ভাষ্যসহ সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র Bibliothica Indica-শ্রেণীতে প্রচার করেন। পরে ১৮৬২-৬৫ খৃষ্টাব্দে ব্যালান্‌টাইন (Ballantyne) Sankhya Aphorisms of Kapila এই নাম দিয়া সাংখ্য সূত্রের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গার্বের (Garbe) Die Sankhya Philosophie জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়। সাংখ্য সম্বন্ধে ইহাই পাশ্চাত্য দেশে সর্বোত্তম গ্রন্থ। শুনিয়াছি ফরাসি দার্শনিক কুঁজের দর্শনের ইতিহাস (Cousin's History of Philosophy)-গ্রন্থেও সাংখ্য মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। ইহার পর অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর তাঁহার Six Systems of Hindu Philosophy-গ্রন্থে তত্ত্বসমাস ও আনুরিক্তত ভাষ্য অবলম্বন করিয়া সাংখ্যতত্ত্বের বিবরণ করেন। পরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কিথ্‌ সাহেবের The Sankhya System নামক উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।*

বিগত দশ বৎসরের মধ্যে কয়েকজন এদেশীয় পণ্ডিত সাংখ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নাম

* ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জোসেফ ডাহালমন (Joseph Dahlman) জার্মান ভাষায় তাঁহার Sankhya Philosophy after the Mahabharata-গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। জার্মান ভাষাভিজ্ঞ কোন বাঙ্গালীকে এই গ্রন্থের আলোচনা করিতে দেখিলে আমি সুখী হইব।

এ স্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন—তবে অন্ধ্র প্রদেশের সার সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণনের History of Indian Philosophy দ্বিতীয় খণ্ড এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের যোগদর্শন -বিষয়ক গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয়েই সুপণ্ডিত এবং সাংখ্য শাস্ত্রে সুপ্রবিষ্ট। তবে আমার মনে হয় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণনের আলোচনা যেন অধিকতর উপাদেয় ও হৃদয়গ্রাহী।

তৃতীয় অধ্যায়

সাংখ্যমতের প্রাচীনতা

সাংখ্যমত কত দিনের? এ মত কি প্রাচীন কিম্বা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন?

প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের (যাঁহাদের Orientalists বলে) মধ্যে এক দল আছেন—আর এই দলের মতই পশ্চিমে প্রবল—যাঁহারা ভারতবর্ষের কোন কিছুকেই প্রাচীন বলিতে রাজি নহেন। তাঁহাদের মতে বেদ ত' কৃষকের গান বটেই—সে গান আবার মাত্র ৩০০০ বৎসর পূর্বে উৎসারিত হইয়াছিল। এ দল বলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ—যাহা আমরা ৫০০০ বৎসরের ঘটনা বলি—১৩০০ খৃষ্ট-পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। পুরাণ—যাহাকে এ দেশের পণ্ডিতেরা বেদব্যাসের সংকলিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা ঐ দলের পণ্ডিতদিগের মতে নিতান্তই আধুনিক গ্রন্থ। এমন কি 'প্রত্ন ওকঃ' হইতে আমাদের আর্য পিতৃপুরুষদিগের ভারতাগমন, যাহা সুদূর অতীতের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন, তাহাও নাকি (ঐ সকল প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে) মাত্র ৪০০০ বৎসরের ঘটনা! যদি একেবারে অসম্ভব না হইত, তবে ঐ দলের পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই বুদ্ধদেবকে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মপ্রচারক এবং শঙ্করাচার্যকে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সমসাময়িক বলিতেন। অবশ্য যতদিন ইয়ুরোপের লোকেরা তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের কদর্থ করিয়া, সৃষ্টিব্যাপারকে ছয় হাজার বৎসরের ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিতেন, ততদিন ভারতীয় সুপ্রাচীন গ্রন্থাদিকে অর্বাচীন বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন যখন তাঁহারা ভূতত্ত্ব-বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের ফলে আমাদের

এই পৃথিবীর বয়স এককোটি বৎসরেরও অধিক বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তখন ভারতীয় ঘটনাবলিকে ২।১ হাজার বৎসর পিছাইয়া দিলেও কিছু ক্ষতি আছে কি ?

ঐ দলের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যে, সাংখ্যমতের প্রাচীনতার অপলাপ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। স্যার চার্লস ইলিয়ট্‌কে এই দলের প্রতিনিধিস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার Hinduism and Buddhism -গ্রন্থের ২৯৬ পৃষ্ঠায় সাংখ্যমতের মূল গ্রন্থত্রয়—তত্ত্বসমাস, প্রবচনসূত্র ও সাংখ্যকারিকা—সম্বন্ধে এইরূপ লিখিতেছেন :— 'এই সকল গ্রন্থই আধুনিক। সাংখ্য প্রবচনসূত্র, যাহা কপিলসূত্র বলিয়া সম্মানিত হয়, তাহা ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর গ্রন্থ। সাংখ্যকারিকা —যাহা তদানীং প্রচলিত গ্রন্থবিশেষের সংকলন মাত্র এবং যাহা ৫৬০ খৃষ্টাব্দে চৈনিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল—ঐ গ্রন্থ হয়ত ২।১ শতাব্দীর পূর্বেকার। তত্ত্বসমাস—যাহা সাংখ্যতত্ত্বের বিষয়তালিকামাত্র এবং যাহাকে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার সাংখ্যমতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বিবেচনা করিতেন—ঐ গ্রন্থের প্রাচীনতা সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সন্দিহান।' *

অধ্যাপক গার্বে—যিনি সাংখ্য সম্বন্ধে ইয়ুরোপে সর্বোত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—তাঁহার মতে সাংখ্যমতের উৎপত্তি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে।

---

* The accepted text books are all late. The most respected is the Sankya Prabachana attributed to Kapila but generally assigned by European critics to the 14th century A. D. Considerably more ancient but still clearly a metrical epitome of a System already existing, is the Sankya-Karika, a poem of 70 verses which was translated into Chinese about 560 A. D. and may be a few centuries earlier. Max-Muller regarded the Tatwasamasa, a short tract consisting chiefly of an enumeration of topics, as the most ancient Sankhya formulary, but the opinion of scholars as to its age is not unanimous.—Sir Charles Elliot's Hinduism and Buddhism, 2nd vol, p 296

'তৎপরে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ঐ মত ভারতীয় সুধীসমাজে প্রসার লাভ করিয়া অবশেষে ষড়্‌দর্শনের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল। ইহারও পরে মহাভারত, মনুসংহিতা এবং পুরাণাদি হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থে ঐ সাংখ্যমত সমাদরে গৃহীত হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ সাংখ্যমতের পরিচায়ক যে গ্রন্থ এখন প্রচলিত আছে (অধ্যাপক গার্বে নিশ্চয়ই এখানে সাংখ্যকারিকাকে লক্ষ্য করিতেছেন)—ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে।' * অধ্যাপক গার্বে বলিলেন, সাংখ্যকারিকা খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়। এ কথার একটু বিচার করিতে চাই। অনেক প্রাচ্য বিদ্যাবিৎই এখন স্বীকার করেন যে, 'সাংখ্যকারিকা'কার বৌদ্ধ-দার্শনিক বসুবন্ধুর পূর্ববর্তী। ঐ বসুবন্ধুর কয়েকখানি গ্রন্থ ৪০৪ খৃষ্টাব্দে † এবং বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গের 'যোগাচার্য্য ভূমিশাস্ত্র' ৪১৪-২১ খৃষ্টাব্দে ধর্মরক্ষ কর্তৃক চৈনিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অতএব সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ নিশ্চয়ই চতুর্থ

---

* The oldest text book of this system that has come down to us complete belongs to the 5th century A. D.

In the first century B. C. the Brahmans began to adopt the doctrines of the Sankhyas and later on it was received into the so-called orthodox systems. The Sankhya system flourished chiefly in the early centuries of our era. Since that time the whole of the Indian literature, so far as it touches philosophical thought, beginning with the Mahabharata and the Laws of Manu, especially the literature of the mythical and legendary Puranas, has been saturated by the doctrines of the Sankhyas——R. Garbe in his article on Sankhya in Encyclopedia of Religion and Ethics.

† According to Noel Peri (see his A propos de la date de Vasubandhu, pp 339-40), some books of Vasubandhu were translated into the Chinese in A. D. 404. So he must have lived in the 4th century of the Christian era. Vincent Smith in his 'Early History of India' (3rd. Edn. App. N p 328) carries it back still further by about 200 years.

শতকের পূর্ববর্তী।* আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা (মাঠর বৃত্তিসহ) পঞ্চম শতকে পণ্ডিত পরমার্থ কর্তৃক চৈনিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।† কোন গ্রন্থের খ্যাতি বিদেশে পঁহুছিতে এবং তাহার প্রচলনের ফলে তদুপরি বৃত্তি রচিত হইতে অন্ততঃ দুই এক শতাব্দীর প্রয়োজন নয় কি? যদিই তর্কস্থলে অধ্যাপক গার্বের মত সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, কিন্তু পঞ্চশিখাচার্যের ষষ্ঠিতন্ত্র? তাহার বয়ঃক্রম কত? এ সম্বন্ধে অধ্যাপক গার্বেকে আলোচনা করিতে দেখিলে আমরা সুখী হইতাম। কারণ, খুব সম্ভব ঐ গ্রন্থ খৃষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে রচিত হইয়াছিল। সে কথা আমরা পরে বলিব।

---

* Prof. Radha Krishnan places him in the 3rd century A. D. and says that he is earlier than Vasubandhu, who is now assigned to the 4th century A. D.

† Dr. Takasaku (who in 1904 published in the Bulletin de l' E'cole Francaise d' Extreme Orient', Tome iv, a French version of the Chinese translation of the Sankya Karika with the commentary) assigns to Paramartha a period from A. D. 449 to 509.

চৈনিক ভাষায় অনূদিত টীকা 'মাঠর বৃত্তি' কিনা, কেহ কেহ তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ টীকা যদি মাঠর বৃত্তি না হয়, তবে কি? পরমার্থ গৌড়পাদের পূর্ববর্তী—অতএব তাঁহার অনূদিত টীকা গৌড়পাদ-ভাষ্য হইতে পারে না—বিশেষতঃ বখন মেলন করিলে দেখা যায় গৌড়পাদ-ভাষ্যের সহিত ঐ টীকার মিল নাই।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বারাণসী চৌখাম্বা সিরিজে পণ্ডিত বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার সম্পাদকতায় ঐ মাঠর বৃত্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। পণ্ডিতজী বলেন, গৌড়পাদ ভাষ্য মাঠর বৃত্তিরই সংক্ষেপ—অতো গৌড়পাদীয়ঃ মাঠরবৃত্ত্যা এব সংক্ষেপ ইতি ভাতি। মাঠর বৃত্তিতে গীতা, ভাগবত প্রভৃতি হইতে বচন উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ৩১ কারিকার বৃত্তিতে 'হস্তামলক' হইতে একাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব এ বৃত্তি গৌড়পাদ হইতে প্রাচীনতর কিনা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। শুনিলাম পুণা হইতে সম্প্রতি মাঠর বৃত্তির অন্য সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে—তৎপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আর এক কথা। অধ্যাপক গার্বে উল্লেখ করিলেন যে, মহাভারতে, মনুসংহিতায় এবং পুরাণাদিতে সাংখ্যমতের সন্নিবেশ আছে। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থকে তিনি খৃষ্টের পরবর্তী গ্রন্থ বলিলেন কি প্রমাণে? আশ্বলায়ন গৃহ্য-সূত্রে ভারতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়:—

সূত্র-ভাষ্য-ভারত-ধর্মাচার্যা যে চান্যে আচার্যা স্তে সর্বে তৃপ্যন্তু—৩।৪

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে আমরা ভারতের উল্লেখ পাইলাম। অধ্যাপক গার্বে হয়ত বলিবেন যে, আশ্বলায়ন ঐ সূত্রে বেদব্যাস-প্রণীত মূল ভারতসংহিতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন—বৈশম্পায়ন ও সৌতি কর্তৃক সংপ্রসারিত মহাভারতকে লক্ষ্য করেন নাই।

চাতুর্বিংশতি-সাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্—মহাভারত, আদি পর্ব।

এ কথার আমরা প্রতিবাদ করিব না—তবে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিব যে, আশ্বলায়নের পূর্ববর্তী পাণিনি-সূত্রেও আমরা মহাভারতের উল্লেখ পাই।

মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্ণগৃষ্টীষ্বাসজাবালভার-ভারত-হৈলিহিলরৌরবপ্রবৃদ্ধেষু

—পাণিনি, ৬।২।৩৮

—এই সূত্রে পাণিনি 'মহাভারত' পদ সিদ্ধ করিলেন। আমরা জানি কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পাণিনিকেও আধুনিক বলিতে চান। কিন্তু তাঁহারা, অধ্যাপক গোল্ডষ্টকর্ পাণিনির প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণের উপন্যাস করিয়াছেন, তাহার খণ্ডন করিতে পারিয়াছেন কি? পাণিনির সময়ে 'নির্বাণ' শব্দে 'মোক্ষ' বুঝাইত না—'নির্বাত' বুঝাইত—

নির্বাণোঽবাতে—পাণিনি, ৮।২।৫০

পাণিনির সময়ে 'আরণ্যক' শব্দে অরণ্যে অনুচ্যমান আরণ্যক-গ্রন্থ বুঝাইত না—'অরণ্যবাসী, বনচর' বুঝাইত—

অরণ্যাৎ মনুষ্যে—পাণিনি, ৪।২।১২৯

অতএব পাণিনি যে বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী, এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।* সেই পাণিনির সময়ে মহাভারত প্রচলিত ছিল। অতএব মহাভারতকে খৃষ্টের পরবর্তী কিরূপে বলিব? তার পর মনুসংহিতা। এখন যে ভৃগু-প্রোক্ত মনুসংহিতা প্রচলিত আছে, নিঃসন্দেহে তাহার বয়স নির্ণয় করা দুরূহ। তবে আমরা দেখিতে পাই যে, রামায়ণ-রচনার সময়েও শ্লোকাত্মক মনুসংহিতা ভারতীয় ঋষিসমাজে প্রচলিত ছিল। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র আত্মকৃত বালি-বধ-ক্ষালনের জন্য বলিতেছেন—

> শ্রূয়েতে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্রবৎসলৌ।
> রাজভির্ধৃত-দণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
> নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥
> শাসনাদ্বাপি মোক্ষাদ্বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
> রাজা ত্বশাসন্ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষং॥ —১৮ সর্গ, ৩১-২

এ শ্লোকদ্বয় প্রচলিত মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়।† অতএব মনুসংহিতাও খৃষ্টের পরবর্তী নহে।

আর পুরাণ? পুরাণের মধ্যে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু খৃষ্টের বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে যে, পুরাণসকল প্রচলিত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অথর্ববেদে এবং ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে যে পুরাণ-সাহিত্যের উল্লেখ আছে, তাহার কথা আমরা ধরিব

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এখন পাণিনিকে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে ফেলেন।

> † শাসনাদ্বা বিমোক্ষাদ্বা স্তেনঃ স্তেয়াদ্ বিমুচ্যতে।
> অশাসিত্বা তু তং রাজা স্তেনস্যাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
> রাজনির্ধৃত-দণ্ডাস্তু কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
> নির্মলাঃ স্বর্গ মায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥
> —মনুসংহিতা, ৮৷৩১৬, ৩১৮

না।* কারণ, ঐ পুরাণ ও আমাদের প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ অভিন্ন না-ও হইতে পারে। কিন্তু বেদব্যাস যে পুরাণ সংকলন করিয়াছিলেন—

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈঃ গাথাভিঃকল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসহিতাং চক্রে, পুরাণার্থ-বিশারদঃ॥ †

—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।১৬

—যে পুরাণ-সংহিতা অবলম্বন করিয়া তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণ অষ্টাদশ পুরাণ (ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রভৃতি) প্রচার করেন—সে সকল পুরাণ কি খৃষ্ট জন্মের পূর্বে প্রচলিত ছিল না? যদি না ছিল তবে খৃষ্ট-পূর্ববর্তী আপস্তম্ব—নাম করিয়া ভবিষ্য-পুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিলেন কিরূপে?

আভূতসংপ্লবাং তে সর্গজিতঃ পুনঃ সর্গে বীজার্থা ভবন্তীতি ভবিষ্যং পুরাণে

—আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ২।২৪।৫-৬

আবার তিনি অন্যত্র 'অথ পুরাণে শ্লোকৌ উদাহরন্তি' বলিয়া আর্যসংস্কৃতে লিখিত নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিলেন কিরূপে—যে শ্লোক সর্বাপেক্ষা

---

* ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ —অথর্ববেদ ১১।৭।২৪

পুরাণং বেদঃ সোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত —শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৩।৪।৩।১৩

ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি অনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি অস্যৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি—বৃহদারণ্যক ২।৪।১০

আথর্বণং চতুর্থম্ ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পৈত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যম্ ইত্যাদি—ছান্দোগ্য, ৭।১।২

† পুরাণের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তবে বিষ্ণুপুরাণের ঐ উদ্ধৃত শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে, বেদব্যাসের সময়ে যে সকল আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল, তিনি তাহা সংকলন করিয়া পুরাণ-সংহিতা রচনা করেন। অতএব বেদব্যাস কেবল বেদের 'ব্যাস' (Compiler) নহেন, পুরাণেরও 'ব্যাস' বটেন।

অর্বাচীন ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এখনও পাওয়া যাইতেছে ?

"অথ পুরাণে শ্লোকাবুদাহরন্তি।
অষ্টাশীতি সহস্রাণি যে প্রজামীসিরর্ষয়ঃ।
দক্ষিণেনার্যম্নঃ পন্থানং তে শ্মশানানি ভেজিরে ॥
অষ্টাশীতি সহস্রাণি যে প্রজাং নেষিরর্ষয়ঃ।
উত্তরেণার্যম্নঃ পন্থানং তেঽমৃতত্বং হি কল্পতে ॥

—আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ২।২৩।৩৫*

আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রের অনুবাদক ডাক্তার বুল্‌হার্ (Dr. Bulher) বলেন, ঐ সূত্রগ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পরে রচিত হয় নাই, এমন কি পাণিনির পূর্ববর্তীও হইতে পারে। ইহা হইতে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, খৃষ্টজন্মের পূর্ব হইতেই বিভিন্ন পুরাণসমূহ প্রচলিত ছিল ?

অতএব মহাভারত, মনুসংহিতা এবং পুরাণাদিতে যখন সাংখ্যমতের সবিশেষ বিবরণ রহিয়াছে, তখন খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এই মতের উৎপত্তি—গার্বের এই সিদ্ধান্ত আমরা কিরূপে স্বীকার করিব ?

যাঁহারা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভগবদ্‌গীতার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন কিরূপে সাংখ্যমত ওতপ্রোতভাবে গীতার মধ্যে

---

* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই শ্লোকদ্বয়ের অনুরূপ যে শ্লোক পাওয়া যায়, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।

অষ্টাশীতি সহস্রাণি প্রোক্তানি গৃহমেধিনাম্।
অর্যম্নো দক্ষিণা যে তু পিতৃযানং সমাশ্রিতাঃ॥
দারাগ্নিহোত্রিণস্তে বৈ যে প্রজাহেতবঃ স্মৃতাঃ।
গৃহমেধিনাস্তু সংখ্যেয়াঃ শ্মশানান্যাশ্রয়ন্তি যে॥
অষ্টাশীতি সহস্রাণি নিহিতা উত্তরায়ণে।
যে শ্রূয়ন্তে দিবং প্রাপ্তা ঋষয় ঊর্দ্ধরেতসঃ॥—৩৫।১০৩-৪

অনুস্যূত আছে। এ সম্বন্ধে আমার 'গীতায় ঈশ্বরবাদ'-গ্রন্থে আমি বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুক্তি করিব না। তবে অভিজ্ঞ পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিব যে, গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান্ সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক কপিল ঋষিকে সিদ্ধগণের অগ্রণী বলিয়াছেন—সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ। মহাভারতের অন্যত্রও * সাংখ্যশাস্ত্রের উল্লেখ আছে—

সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে

—শান্তিপর্ব, ৩৪৯।৬৫

সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যান-দর্শনম্

—শান্তিপর্ব, ৩০৬।২৬

পুরাণেরও নানা স্থানে সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে। ভাগবতের দেবহূতি-কপিল-সংবাদ—যেখানে কপিলদেব নিজ মুখে সাংখ্যতত্ত্বের বিবরণ করিতে-ছেন—পুরাণ-পাঠকমাত্রেরই সুবিদিত। অন্যত্র ভাগবত বলিয়াছেন—

কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদ্ অভূৎ ॥—২।৫।২২

এইরূপ বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে পরাশর বলিতেছেন—

একঃ শুদ্ধঃ ক্ষরো নিত্যঃ সর্বব্যাপী পুরাতনঃ।
সোঽপ্যংশঃ সর্বভূতস্য মৈত্রেয় ! পরমাত্মনঃ ॥
প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥—৬।৪।৩৫, ৩৮

'পুরুষ এক, শুদ্ধ, অক্ষর, নিত্য ও সর্বব্যাপী ; তিনি সর্বভূতময় পরমাত্মার অংশ। আমি তোমাকে যে ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপা প্রকৃতির কথা বলিয়াছি,

---

* এ প্রসঙ্গে অনুগীতা, মোক্ষপর্বাধ্যায় এবং শান্তিপর্বের ৩০২ হইতে ৩০৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ঐ সকল অধ্যায়ে সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে এবং পঞ্চবিংশ তত্ত্ব পুরুষের উপর ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব পরমাত্মার বিবরণ আছে।

সেই প্রকৃতি ও এই পুরুষ—উভয়ই পরমাত্মাতে বিলীন হন।'

ইহা ছাড়া বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, পদ্ম-পুরাণের পাতালখণ্ডের ৯৭তম অধ্যায়ে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৪৪তম অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে এবং অগ্নিপুরাণের ১৭তম অধ্যায়েও সাংখ্যতত্ত্বের বিবরণ আছে। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে যে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা অনেকাংশে সাংখ্যমতের অনুযায়ী। মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে গুণত্রয়ের বিবেকপ্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে।

তাবুভৌ ভূতসম্পৃক্তৌ মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ।
উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥

* * *

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্ ॥
দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ ॥

—১২।১৪, ৩৮, ৪০

'সেই মহান্ ও ক্ষেত্রজ্ঞ ভূত-সম্পৃক্ত হইয়া নানারূপ ভূতে অবস্থিত তাঁহাকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে। * * তমোগুণের লক্ষণ কাম, রজোগুণের লক্ষণ অর্থ এবং সত্ত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম। উত্তরোত্তর গুণত্রয়ের শ্রেষ্ঠতা। সাত্ত্বিক লোকেরা দেবত্ব, রাজসিক লোকেরা মনুষ্যত্ব এবং তামসিক লোকেরা তির্যকত্ব প্রাপ্ত হয়—এইরূপ জীবের ত্রিবিধা গতি।'

অধিকন্তু সুশ্রুতসংহিতার শারীর স্থানের প্রথম অধ্যায়ে সাংখ্য মতের বিবৃতি আছে।

কিন্তু এই সকল বিবাদাস্পদ মহাভারতাদি গ্রন্থের উপর নির্ভর না করিয়া, যে সকল গ্রন্থের কাল সম্বন্ধে বিবাদ নাই, সেই সকল গ্রন্থ অবলম্বন

করিয়াই আমরা সাংখ্যমতের প্রাচীনতা স্থাপন করিতে চাই। প্রথমতঃ কালিদাসের কথা ধরা যাউক,—তিনি পঞ্চম শতকের লোক। যাঁহারা তাঁহার কাব্য ও নাটকাদির আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন কালিদাস সাংখ্য মতের সহিত সুপরিচিত ছিলেন; শকুন্তলার নান্দীশ্লোকে প্রকৃতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে,—'যাম্ আহুঃ সর্ববীজ-প্রকৃতিরিতি' এবং রঘুবংশের নমস্কার স্তোত্রে আমরা ত্রিগুণের উল্লেখ পাই—

'নমস্ত্রিমূর্তয়ে তুভ্যং প্রাক্‌সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়-বিভাগায় পশ্চাদ্ ভেদম্ উপেয়ুষে॥

বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ কালিদাসের পূর্ববর্তী,—তাঁহার বুদ্ধ-চরিতের দ্বাদশ সর্গে সাংখ্যমতের সম্পূর্ণ বিবৃতি আছে। অশ্বঘোষ বলেন, বুদ্ধদেবের কিশোর অবস্থায় অরাড নামক তাঁহার এক আচার্য ছিলেন,—তিনি বুদ্ধদেবকে সম্পূর্ণ সাংখ্য সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন :—

ইত্যরাডঃ কুমারস্য মাহাত্ম্যাদেব চোদিতঃ।
সংক্ষিপ্তং কথয়াঞ্চক্রে স্বস্য শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ম্॥
শ্রূয়তাম্ অয়মস্মাকম্ সিদ্ধান্তঃ শৃণ্বতাং বর!
যথা ভবতি সংসারো যথা বৈ পরিবর্ততে॥

—বুদ্ধ চরিত ১২।১৫-১৬

ইহার পর অরাড—প্রকৃতি, বিকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্র, অব্যক্ত, ব্যক্ত, অবিশেষ, বিশেষ, তমঃ, মোহ, মহামোহ ইত্যাদি সাংখ্যমতের এক বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিলেন। আমরা পরিশিষ্টে ঐ বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক লক্ষ্য করিবেন অশ্বঘোষের সময়ে সাংখ্যমত ভারত-বর্ষে কিরূপ প্রসার ও বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী 'ব্রহ্মজালসূত্রে'ও আমরা সাংখ্যমতের উল্লেখ পাই। ঐ সূত্রকার বলেন, সাংখ্যেরা প্রকৃতি ও পুরুষকে নিত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

অতঃপর আমরা ন্যায়দর্শনের বাৎসায়ন-ভাষ্যের উল্লেখ করিব। বাৎসায়ন ও চন্দ্রগুপ্তের সচিব চাণক্য এক ব্যক্তি কিনা নিশ্চয় করা কঠিন, তবে গোতমসূত্রের এই প্রাচীন ভাষ্য যে খৃষ্টপূর্ববর্তী, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। এই বাৎসায়ন-ভাষ্যে আমরা সাংখ্যমতের উল্লেখ পাই—যথা—নাসত আত্মলাভঃ ন সত আত্মহানং। নিরতিশয়াশ্চেতনা দেহেন্দ্রিয়-মনঃসু বিষয়েষু তৎতৎকারণেষু চ বিশেষ ইতি সাংখ্যানাম্।

বাৎসায়ন-ভাষ্যের পূর্ববর্তী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে—সাংখ্যং যোগং লোকায়তঞ্চ ইত্যান্বীক্ষকী। কৌটিল্য বলিতেছেন—সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত—এই তিন লইয়া আন্বীক্ষিকী বিদ্যা।

বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র খুব সম্ভবতঃ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের পূর্ববর্তী; কারণ, পাণিনিতে আমরা পারাশর্যের এক 'ভিক্ষুসূত্রে'র উল্লেখ পাই। পারাশর্য পরাশর-তনয় বাদরায়ণ ভিন্ন আর কে? 'ভিক্ষুসূত্র'ও সন্ন্যাসী বা চতুর্থাশ্রমী ভিক্ষুদিগের পঠনীয় বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে। দর্শনাভিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ঐ ব্রহ্মসূত্রের অনেক স্থলেই সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে 'ঈক্ষতে র্নাশব্দম্' 'প্রকৃতিশ্চ গীয়তে' ইত্যাদি অনেক সূত্রেরই উদ্ধার করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা করা নিষ্প্রয়োজন। *

কৌটিল্যের ও বাদরায়ণের পূর্ববর্তী উপনিষদেও স্থানে স্থানে সাংখ্য-মতের উল্লেখ এবং তদনুযায়ী উপদেশ দৃষ্ট হয়। নিম্নে আমরা কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম। সাংখ্যমতানুযায়ী পুরুষের নিঃসঙ্গতা লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিতেছেন—অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ—৪।৩।১৫

তমো বা ইদমগ্র আসীৎ একম্। তৎ পরে স্যাৎ। তৎপরেণ ঈরিতং

* জিজ্ঞাসু পাঠক ব্রহ্মসূত্রের ১।১।৫ হইতে ১।১।১১ সূত্র, ১।৪।১ হইতে ১।৪।১৪ সূত্র, ১।৪।২৩ হইতে ১।৪।২৭ সূত্র, ২।১।১ হইতে ২।১।১২ সূত্র, ২।২।১ হইতে ২।২।১০ সূত্র, দৃষ্টি করিবেন।

বিষমত্বং প্রয়াতি। এতদ্ রূপং বৈ রজঃ। তং রজঃ খল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াতি। এতদ্ বৈ সত্ত্বস্য রূপম্—মৈত্রা, ৫।২

ঐ মৈত্রায়নী উপনিষদে ত্রিগুণ (২।৫, ৫।২) ও তন্মাত্রের (৩।২) উল্লেখ আছে এবং পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভূতানি পঞ্চতন্মাত্রাণি পঞ্চ মহাভূতানি –মহ, ১

তন্মাত্রাণি সদস্যা মহাভূতানি প্রযাজ্যাঃ—প্রাণাগ্নি, ৪

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চ আপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চ আকাশমাত্রা চ—প্রশ্ন, ৪।৮

কঠ উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় ঐ উপনিষদ্ অনেকস্থলে সাংখ্যভাবে ভাবিত।

মনসস্তু পরাবুদ্ধিঃ বুদ্ধে রাত্মামহান্ পরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।—কঠ, ৩।১১-২

এখানে আমরা অব্যক্ত, মহান্, বুদ্ধি, মনস্ ও পুরুষের উল্লেখ পাইলাম।

পুনশ্চ— মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাৎ অধিমহান্ আত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্। —৬।৭
অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ —গর্ভ, ৩
বিকারজননীং মায়াম্ অষ্টরূপাম্ অজাং ধ্রুবাম্—চূলিকা *

যদা শেতে রুদ্রঃ তদা সংহার্যতে প্রজাঃ। উচ্ছ্বসিতে তমো ভবতি তমসঃ আপঃ মথ্যমানং ফেণো ভবতি।—অথর্বশির, ৬

অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবী একীভবতি।

---

* এমন কি অধ্যাপক কীথ (Keith) বলিতেছেন—There is in detail in the Sankya, little that cannot be found in the Upanisads in some place or other.—p 60.

এই সকল বচনে আমরা তমঃশব্দবাচ্য সাংখ্যদিগের প্রকৃতি এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির এই গুণত্রয়, পঞ্চতন্মাত্র, প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি প্রভৃতি সাংখ্যমতের বিবরণ পাইলাম। এই প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সেই প্রসিদ্ধ শ্লোক :—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং, বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ"

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪।৫

(প্রকৃতি একা, প্রকৃতি অজা, প্রকৃতি লোহিতশুক্লকৃষ্ণা (ত্রিগুণময়ী), প্রকৃতি সজাতীয় বিবিধ বিকারের সৃষ্টিকর্ত্রী)—সকলেরই স্মরণ হইবে। উদ্ধৃত শ্লোকে সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে যে লক্ষ্য করা হইতেছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু শঙ্করাচার্য তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যে এ বিষয়ে বিবাদ উত্থাপন করিয়াছেন ; কারণ, তাহা না করিলে সাংখ্যমতকে বেদসম্মত স্বীকার করিতে হয়। তিনি বলেন, ঐ শ্লোকের লক্ষ্য সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে—বেদান্তের অনির্বচনীয় মায়া। তর্কস্থলে যদি তাহাই স্বীকার করা যায়, তথাপি পৈঙ্গল-উপনিষদুক্ত নিম্নোক্ত বচনটির কি গতি হইবে ?—তস্মিন্ লোহিতশুক্লকৃষ্ণগুণময়ী গুণসাম্যা নির্বাচ্যা মূলপ্রকৃতিরাসীৎ—পৈঙ্গল, ১। এই বচনে যে সাংখ্যোক্ত মূলপ্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হইল, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অন্যত্র মহেশ্বরকে প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতি বলা হইয়াছে—

প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ—শ্বেত ৬।১৬

প্রধান=প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ=পুরুষ। অতএব এই শ্লোকেও যে সাংখ্যমতকে লক্ষ্য করা হইল, ইহা নিঃসন্দেহ। পুনশ্চ শ্বেতাশ্বতর প্রকৃতিকে মায়া বলিয়াছেন—মায়াংতু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।

আরও কথা আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ স্পষ্টাক্ষরে সাংখ্যশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন—তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্।

অন্যত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিতেছেন—

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে, জ্ঞানৈ র্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ

—শ্বেতাশ্ব, ৫।২

'যিনি আদিতে 'কপিল' ঋষিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভূষিত করিয়াছিলেন'—এই শ্লোকের লক্ষিত 'কপিল' ঋষি কি সাংখ্য-শাস্ত্র-প্রবর্তক কপিল ঋষি?—সাংখ্যেরা যাঁহাকে আদি বিদ্বান্ বলেন এবং যিনি জ্ঞান-বৈরাগ্য-ঐশ্বর্যাদি সহজাত গুণ লইয়া আদিসর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? অতএব প্রমাণিত হইল যে, সেই প্রাচীন উপনিষদ্-যুগেও সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল।

এমন কি, সুপ্রাচীন অথর্ব বেদেও সাংখ্যোক্ত গুণত্রয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে :—

অসুং তে আয়ুঃ পুনরাভরামি রজস্তমো মোপগা মা প্রমেষ্ঠা—অষ্টম কাণ্ড, প্রথম অনুবাক্, তৃতীয় সূক্ত।

এ মন্ত্রের ভাষ্য এইরূপ—তদর্থং তে তব অসুং প্রাণং মৃত্যুনা অপহৃতম্ আয়ুশ্চ পুনঃ আভরামি আহরামি। ত্বং চ রজঃ রাগম্ অস্মাকম্ সত্ত্বগুণ-প্রতিবন্ধকং মোপগা মা প্রাপ্নুহি, এবং তমঃ আবরকং হিতাহিত-বিবেক-প্রতিরোধকং তম-আখ্য-গুণম্ মোপগাঃ। ন কেবলং রজস্তমসোঃ অপ্রাপ্তিরেব প্রার্থ্যতে কিং তু মৃতিনিবারণমপি মা প্রমেষ্ঠা ইতি। হিংসাং মা প্রাপ্নুহি। মীঙ্ হিংসায়াম্।

এই অথর্ব মন্ত্রের ভাবানুবাদ এই :—"তোমার প্রাণ ও আয়ুকে (যাহা মৃত্যু কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে) তাহাকে পুনরায় আহরণ করি,—তুমি রজঃকে ও তমঃকে (যাহা সত্ত্বগুণের প্রতিবন্ধক) প্রাপ্ত হইও না—অপিচ মৃত্যুকেও প্রাপ্ত হইও না।" এই মন্ত্রে আমরা স্পষ্টতঃ সাংখ্যোক্ত রজঃ ও তমঃ গুণের উল্লেখ পাইলাম।

অতএব সাংখ্যমতকে সুপ্রাচীন না বলিয়া উপায় কি?

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ধারণা যে, তাঁহারা যাহাকে বৈদিক যুগ বলেন, সেই যুগে বেদের গান ও যজ্ঞের বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কোন সাহিত্যই প্রচলিত ছিল না। এ মত কিন্তু ভ্রমাত্মক। যে উপনিষদ্-দ্বয়কে পাশ্চাত্যেরা প্রাচীনতম উপনিষদ্ বলিয়া স্বীকার করেন, সেই ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়—সেই সুপ্রাচীন যুগেও ঋষি-সমাজে বিবিধ বিদ্যা ও সাহিত্যের কিরূপ প্রসার ছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিতে পাই, এক সময়ে নারদ সনৎকুমারের সমীপে বিদ্যার্থী হইয়া উপনীত হন—অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ।—ছা, ৭।১।১

সনৎকুমার শিষ্যভাবে উপসন্ন নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছ? তদুত্তরে নারদ নিজের অধীত বিদ্যার এই দীর্ঘ তালিকা প্রদান করিলেন :—ঋগ্‌বেদম্ ভগবো অধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদং আথর্বণং চতুর্থম্, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং, পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যম্ একায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাম্ এতং সর্বং ভগবোঽধ্যেমি।

'আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যজুর্বেদ ও সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; চতুর্থ অথর্ববেদ, তাহাও অধ্যয়ন করিয়াছি। পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি। পিত্র্য (পিতৃবিদ্যা), রাশি (গণিত), দৈব (Science of portents), নিধি (জ্যোতিষ), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (ধনুর্বেদ), নক্ষত্র-বিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা (নৃত্য-গীত-বাদ্য-শিল্পাদি-বিজ্ঞানানি—শঙ্কর) —এ সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছি।

বৃহদারণ্যক-উপনিষদে নিম্নোক্ত বচনটি দেখিতে পাই—অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্ এতদ্ যদ্ ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্বাঙ্গিরস

ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি অনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি অস্যৈব এতানি সর্বাণি নিশ্বসিতানি—বৃহ, ২।৪।১০

'সেই মহাভূত (মহেশ্বরেরই) নিঃশ্বাস এই সমস্ত—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাসপুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান—এ সমস্তই তাঁহার নিঃশ্বাসমাত্র।'

কে জানে উদ্ধৃত বচনোক্ত 'সূত্রাণি'র মধ্যে কপিলোক্ত প্রাচীন সাংখ্য-সূত্র গণনা করা হয় নাই ?

এ সম্বন্ধে এ দেশীয় পণ্ডিতদিগের একটা আশঙ্কা হইতে পারে। তাঁহারা বলিবেন, বেদ যখন অনাদি, অপৌরুষেয়—তখন তাহার মধ্যে কপিলের নাম বা তৎপ্রবর্তিত সাংখ্যমতের উল্লেখ থাকিবে কিরূপে ? অতএব কষ্ট-কল্পনা করিয়া 'কপিল' অর্থে অন্য কিছু এবং সাংখ্য অর্থে বেদান্ত কর। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হইবে। কারণ, বেদ নিত্য বটে, কিন্তু কি ভাবে বেদ নিত্য ? বেদকে নিত্য বলিলে কি বুঝিতে হইবে যে, বেদের শব্দ বা ভাষা সনাতন ? অর্থাৎ, বেদ এখন যে আকারে নিবদ্ধ রহিয়াছে, অনাদি কাল হইতে সেইরূপই ছিল এবং চিরকাল সেইরূপই থাকিবে। এ মত যুক্তিসহ নহে। ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য অনেক কষ্ট-কল্পনার সাহায্য লইতে হয়; অথচ বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য, বেদের শব্দ বা ভাষাকে নিত্য বলা অনাবশ্যক। সেই জন্য পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিয়াছেন, বেদের শব্দ নিত্য নহে, অর্থই (contents বা idea-ই) নিত্য—'শাব্দী ভাবনা' নিত্য নহে, 'আর্থী ভাবনা'ই নিত্য। উহাই 'বেদ' বা বিদ্যা। এই বিদ্যা চিরদিনই আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। ইহা নিত্য, ইহার উদয় বা বিনাশ নাই। ঋষিরা ধ্যানদৃষ্টির দ্বারা ঐ বিদ্যা দর্শন করেন মাত্র। এই দর্শনের পূর্বেও ঐ বিদ্যা বিদ্যমান ছিল, পরেও থাকিবে। "ঋষ্ দর্শনে"—ইহাই ঋষি নামের সার্থকতা। অর্থাৎ ঋষিরা বেদের দ্রষ্টা, বিদ্যার আবিষ্কারকর্তা বা প্রচারক—প্রবর্তক নহেন। কলাধম্

আমেরিকা আবিষ্কার করিবার পূর্বেও আমেরিকা বিদ্যমান ছিল। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণ সম্পূর্ণ বলে নিজের শক্তি প্রকাশ করিতেছিল। কিন্তু সে শক্তি ইয়ুরোপে তখনও কেহ 'দর্শন' করেন নাই। অতএব ঐ বিদ্যার দ্রষ্টা বা আবিষ্কারকর্তা নিউটন। এইরূপ 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম (ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ)'—এই বিদ্যা তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রকাশিত হইবার পূর্বেও ছিল। কোন ঋষি ধ্যান-দৃষ্টিবলে এই সত্য সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রচার করিলেন। তিনি এই আর্যসত্যের দ্রষ্টা মাত্র। সে সত্য নিত্য, সে বেদ বা বিদ্যা অনাদি। অশরীরিভাবে এই বিদ্যা পূর্বাপর বিদ্যমান ছিল। ঋষি তাহাকে শরীর দান করিলেন মাত্র।

এই অশরীরী বিদ্যাকে শাস্ত্রকারেরা স্ফোট বলিতেন। প্রত্যক্‌ভাবে (subjectively) যাহা বিদ্যা, পরাক্‌ভাবে (objectively) তাহাই শব্দ বা 'স্ফোট'। এই স্ফোটবাদের সহিত প্লেটো (Plato)-প্রচারিত "Idea"-বাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। স্ফোটরূপে যেমন বেদ নিত্য, Idea -রূপে সেইরূপ বিদ্যা নিত্য। প্রলয়কালে এই স্ফোট বা Idea ভগবানে অব্যক্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টির পরে ইহা আবার ব্যক্ত বা ব্যঞ্জিত হয়। এই ভাবেই বেদ অনাদি, অপৌরুষেয় ও সনাতন। ঋষিরা কালে কালে তাহা দর্শন করিয়া প্রচার করেন। সেই জন্য ঋগ্‌বেদে পুরাতন ও নূতন ঋষির উল্লেখ আছে—অগ্নিরীড্যঃ পূর্বেভি র্নূতনৈ রুত। এইরূপ কোন নূতন ঋষি কর্তৃক বেদ বা বিদ্যার একাংশ প্রচারিত হইবার পূর্বে মহর্ষি কপিলের আবির্ভূত হইবার ও সাংখ্যমত প্রচার করিবার পক্ষে বাধা কি?

আমার বিশ্বাস, পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে অধ্যাপক হোরেশ উইল্‌সন্‌ই এ বিষয়ে সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইনি ষষ্টিতন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—It evidently represents doctrines of high

antiquity—doctrines exhibiting profound reflection and subtle reasoning ....We must go back to a remoter age (than the Neo-platonists) for the origin of the dogmas of Kapila.—Preface to his edition of Sankhyakarika.

এতক্ষণ আমরা সাংখ্যমতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। আগামী অধ্যায়ে সাংখ্যমত-প্রবর্তক আদি বিদ্বান্ কপিল সম্পর্কে আলোচনা করিব।

তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

প্রকৃতিশ্চ বিকারশ্চ জন্ম মৃত্যু র্জরৈব চ।
তত্তাবৎ সত্ত্বমিত্যুক্তং স্থিরসত্ত্বঃ পরোঽপি নঃ।।
তত্র তু প্রকৃতির্নাম বিদ্ধি প্রকৃতিকোবিদ।
পঞ্চ ভূতান্যহংকারং বুদ্ধিম্ অব্যক্তমেব চ।।
বিকার ইতি বুদ্ধিং তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ানি চ।
পাণিপাদং চ বাদং চ পায়ূপস্থং তথা মনঃ।।
অস্য ক্ষেত্রস্য বিজ্ঞানাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি সংজ্ঞি চ।
ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চাত্মানং কথয়ংত্যাত্ম-চিংতকাঃ।।
সশিষ্যঃ কপিলশ্চেহ প্রতিবুদ্ধ ইতি স্মৃতিঃ।
সপুত্রঃ প্রতিবুদ্ধশ্চ প্রজাপতিরিহোচ্যতে।।
জায়তে জীর্যতে চৈব বধ্যতে ম্রিয়তে চ যৎ।
তদ্ব্যক্তমিতি বিজ্ঞেয়ম্ অব্যক্তং চ বিপর্যয়াৎ।।
অজ্ঞানং কর্ম তৃষ্ণা চ জ্ঞেয়াঃ সংসারহেতবঃ।
স্থিতোঽস্মিন্ ত্রিতয়ে যস্তু তংসত্ত্বং নাভিবর্ততে।।
বিপ্রত্যয়াদহংকারাৎ সংদেহাদভিসংপ্লবাৎ।
অবিশেষানুপায়াভ্যাম্ সংগাৎ অভ্যবপাততঃ।।
তত্র বিপ্রত্যয়ো নাম বিপরীতং প্রবর্ততে।
অন্যথা কুতস্তে কার্যং মন্তব্যং মন্যতেঽন্যথা।।
ব্রবীম্যহমহং বেদ্মি গচ্ছাম্যহমহং স্থিতঃ।
ইতীহৈবম্ অহংকার স্ত্বনহংকার বর্ততে।।
যস্তু ভাবেন সন্দিগ্ধান্ একীভাবেন পশ্যতি।
মৃৎপিণ্ডবদসন্দেহঃ সন্দেহঃ স ইহোচ্যতে।

য এবাহং স এবেদং মনো বুদ্ধিশ্চ কর্ম চ।
য শ্চৈবং সগণঃ সোঽহম্ ইতি যঃ সোঽভিসংপ্লবঃ॥
অবিশেষং বিশেষজ্ঞ! প্রতিবুদ্ধাপ্রবুদ্ধয়োঃ।
প্রকৃতীনাং চ যো বেদ সোঽবিশেষ ইতি স্মৃতঃ॥
নমস্কার বষট্‌কারৌ প্রোক্ষণাভ্যুক্ষণাদয়ঃ।
অনুপায় ইতি প্রাজ্ঞৈরুপায়জ্ঞ প্রবেদিতঃ॥
সজ্জতে যেন দুর্মেধা মনোবাক্কর্মবুদ্ধিভিঃ।
বিষয়েষনভিষঙ্গঃ সোঽভিষঙ্গ ইতি স্মৃতঃ॥
মমেদম্ অহমস্যেতি যদ্দুঃখমভিমন্যতে।
বিজ্ঞেয়োঽভ্যবপাতঃ স সংসারে যেন পাত্যতে॥
ইত্যবিদ্যা হি বিদ্বাংসঃ পঞ্চপর্বা সমীহতে।
তমো মোহং মহামোহং তামিস্রদ্বয়মেব চ॥
তত্রালস্যং তমো বিদ্ধি মোহং মৃত্যু চ জন্ম চ।
মহামোহস্ত্বসংমোহ কাম ইত্যবগম্যতাম্॥
যস্মাদত্র চ ভূতানি প্রমুহ্যংতি মহাংত্যপি।
তস্মাদেষ মহাবাহো! মহামোহ ইতি স্মৃতঃ॥
তামিস্রমিতি চাক্রোধ ক্রোধমেবাধিকুর্বতে।
বিষাদং চান্ধতামিস্রম্ অবিবাদ প্রচক্ষতে॥
অনয়াবিদ্যয়া বালঃ সংযুক্তঃ পঞ্চপর্বয়া।
সংসারে দুঃখভূয়িষ্ঠে জন্মস্বভি নিষিচ্যতে॥
দ্রষ্টা শ্রোতা চ মংতা চ কার্যং করণমেব চ।
অহমিত্যেবমাগম্য সংসারে পরিবর্ততে॥
ইত্যেভির্হেতুভির্ধীমন্ তমঃ স্রোতঃ প্রবর্ত্ততে।
হেত্বভাবে ফলাভাব ইতি বিজ্ঞাতুমর্হসি॥

তত্র সম্যগ্‌মতি র্বিদ্যান্মোক্ষকাম চতুষ্টয়ং।
প্রতিবুদ্ধা প্রবুদ্ধৌ চ ব্যক্তমব্যক্তমেব চ॥
যথাবদেতদ্বিজ্ঞায় ক্ষেত্রজ্ঞো হি চতুষ্টয়ং।
আর্জবং জবতাং হিত্বা প্রাপ্নোতি পরমক্ষরং॥
ইত্যর্থং ব্রাহ্মণা লোকে পরমব্রহ্মবাদিনঃ।
ব্রহ্মচর্যং চরন্তীহ ব্রাহ্মণান্ বাসয়ন্তি চ॥
ইতি বাক্যমিদং শ্রুত্বা মুনেস্তস্য নৃপাত্মজঃ।
অভ্যুপায়ং চ পপ্রচ্ছ পদমেব চ নৈষ্ঠিকং॥

—বুদ্ধচরিত, ১২।১৭-৪৩

চতুর্থ অধ্যায়

আদি-বিদ্বান্

সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক কপিল দেব।

সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ পুরাতনঃ—মহাভারত, ১২।১৩৭।১১

'সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা কপিল—তাঁহাকে 'পরমর্ষি' বলে।'

ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

পুরুষার্থজ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতম্।—৬৯ কারিকা

'এই গুহ্য পুরুষার্থজ্ঞান অর্থাৎ মোক্ষশাস্ত্র পরমর্ষি কপিল আদিতে প্রচার করেন।'

ঋষ্—দর্শনে। যাঁহারা সত্য 'দর্শন' করেন, তত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতি বা সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সত্য যাঁহাদের নিকট করকলিত কুবলয়বৎ—এক কথায় যাঁহারা দ্রষ্টা (Seer), তাঁহারাই ঋষি। যাঁহারা ঋষি, তাঁহাদের নিকট সত্য একটা পরোক্ষ জনশ্রুতি (hearsay) মাত্র নহে—প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সাক্ষাৎকৃত ব্যাপার। তাঁহারা বলেন না—'ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং'—তাঁহারা বলেন—'অগন্ম জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্'—'আমরা জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছি, আমরা দেবতাকে সাক্ষাৎ জানিয়াছি।' *

ঋষির উপর মহর্ষি—তাঁহার উপর পরমর্ষি (পরম-ঋষি)। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—নমঃ পরম-ঋষিভ্যঃ নমঃ পরম-ঋষিভ্যঃ।

---

* পাশ্চাত্যেরা সত্যের এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভেদ লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, যাঁহারা সত্যকে দর্শন করেন—যাঁহাদের temperamental reaction to the vision of reality আছে তাঁহারাই Prophets, আর যাঁহারা সত্যের গতানুগতিক ব্যাখ্যাতা মাত্র তাঁহারা Priests।

কপিলদেব একজন পরমর্ষি। সাংখ্য-ঐতিহ্য (tradition) এই যে, কপিলদেব সাংখ্যশাস্ত্র তাঁহার শিষ্য আসুরিকে প্রদান করেন। ভাগবত-পুরাণকার এই ঐতিহ্য স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্॥

অর্থাৎ, যে সাংখ্যশাস্ত্রে তত্ত্বসমূহ নির্ণীত হইয়াছে, সেই জ্ঞান সিদ্ধরাজ কপিল আসুরিকে প্রদান করেন। আসুরি উহা তাঁহার শিষ্য পঞ্চশিখকে শিক্ষা দেন এবং পঞ্চশিখ এই শাস্ত্রের বহুল প্রচার করেন। এই পঞ্চশিখকে লক্ষ্য করিয়া মহাভারতকার বলিয়াছেন :—

আসুরেঃ প্রথমং শিষ্যং যমাহুশ্চিরজীবিনম্।

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার কারিকায় ঐ সাংখ্য-পরম্পরার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, পঞ্চশিখের পর শিষ্যপরম্পরাক্রমে যে সাংখ্যজ্ঞান প্রবর্তিত ছিল, তিনি আর্যাছন্দে তাহা সংক্ষিপ্ত করিয়া, তাঁহার 'সাংখ্যকারিকা'য় নিবদ্ধ করিয়াছেন।

এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্॥
শিষ্যপরম্পরাগতম্ ঈশ্বরকৃষ্ণেণ চৈতদার্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্যমতিনা সম্যগ্ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্॥—কারিকা, ৭০-৭১

মাঠরবৃত্তিকার ঐ পরম্পরার এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—কপিলাৎ আসুরিণা প্রাপ্তম্ ইদং জ্ঞানং। ততঃ পঞ্চশিখেন। তস্মাৎ ভার্গব-উলূক-বাল্মীকি-হারীত-দেবল-প্রভৃতীন্ আগতম্। ততঃ তেভ্য ঈশ্বরকৃষ্ণেণ প্রাপ্তম্।

ঐ ভার্গব, উলূক প্রভৃতি সাংখ্যাচার্যগণের কোন গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। তবে বার্ষগণ্য ও ব্যাড়ি (ইহার অপর নাম বিন্ধ্যবাসী)—এই দুই আচার্যের দুই একটি বচন পরবর্তী গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায়। ৩।৫২ যোগসূত্রের ব্যাস-

ভাষ্যে বার্ষগণ্যের এই বচনটি প্রাপ্ত হওয়া যায়—মূর্তিব্যবধিজাতিভেদাভাবাৎ নাস্তি মূল-পৃথক্ত্বম্ ইতি বার্ষগণ্যাঃ। বাচস্পতি মিশ্রও ৪৭ কারিকার তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিয়াছেন—'পঞ্চপর্বা অবিদ্যা' ইত্যাহ ভগবান্ বার্ষগণ্যঃ।

এইরূপ গুণরত্ন সূরি-কৃত ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়-টীকায় (বিন্ধ্যবাসী তু এবম্ আচষ্ট—পুরুষোঽবিকৃতাত্মৈব স্বনির্ভাসম্ অচেতনম্ ইত্যাদি), বাদমহার্ণবে এবং যোগসূত্রের ভোজবৃত্তিতে বিন্ধ্যবাসীর বচন উদ্ধার করা হইয়াছে। যতদূর বুঝা যায়—ঐ বার্ষগণ্য ও বিন্ধ্যবাসী ঈশ্বরকৃষ্ণের পূর্ববর্তী।

সাংখ্যশাস্ত্র-প্রচারক এই তিন জন ঋষির নাম আমরা প্রচলিত তর্পণ-মন্ত্রে* পাই—

সনকশ্চ সনকশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥

গৌড়পাদাচার্য তাঁহার ভাষ্যের উপক্রমে লিখিয়াছেন :—ইহ ভগবান্ ব্রহ্মসুতঃ কপিলো নাম। তদ্ যথা—

সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
আসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ॥

—এই প্রাচীন শ্লোকেও আমরা সাংখ্যশাস্ত্রপ্রচারক কপিল, আসুরি ও

---

* ঋষি-তর্পণের ব্যবস্থা আর্যজাতির একটি প্রাচীন পদ্ধতি। গৃহ্যসূত্রে আশ্বলায়ন লিখিয়াছেন—

সুমন্তু জৈমিনি বৈশম্পায়ন পৈল সূত্র ভাষ্য ভারত ধর্মাচার্যা যে চান্যে আচার্যাস্তে সর্বে তৃপ্যন্তু ৩।৪

যাঁহারা জগতে জ্ঞানবিজ্ঞানধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের আত্মার তর্পণ করা কি সুন্দর প্রথা!

পঞ্চশিখের* উল্লেখ পাইলাম। এখানে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের মধ্যে গণনা করা হইল। ইহার অর্থ এই যে, ইঁহারা সাধারণ মানুষের মত পিতামাতার সহযোগে উৎপন্ন নহেন—ব্রহ্মার ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে তাঁহাদের দেহ গঠিত হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহারা চিরজীবী। মহাভারতের শান্তিপর্বেও আমরা কপিলাদি 'ষট্ ব্রহ্মপুত্রান্ মহানুভাবান্'-এর উল্লেখ পাই।

কপিলদেবকে 'আদি-বিদ্বান্' বলা হয়। ইহার অর্থ কি?

কপিলস্য সহোৎপন্না ধর্মোজ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যঞ্চেতি—গৌড়পাদ

অর্থাৎ, ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এইগুলি তাঁহার সাংসিদ্ধিক বা সহোৎপন্ন ভাব। গৌড়পাদ ৪৩ কারিকার ভাষ্যে বলিয়াছেন—

তত্র সাংসিদ্ধিকা যথা ভগবতঃ কপিলস্য আদিসর্গে উৎপদ্যমানস্য চত্বারো ভাবাঃ সহোৎপন্নাঃ ধর্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যম্ ঐশ্বর্যমিতি।

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন ভগবান্ কপিলদেবের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই ভাবচতুষ্টয় সহজাত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও আমরা ঐ কথা পাইয়াছি।

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।—৫।২

অর্থাৎ, মহেশ্বর আদিসর্গে উৎপন্ন কপিল ঋষিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। এই জ্ঞান, ধর্ম, বৈরাগ্য ঐশ্বর্য—তাঁহার এ জন্মের সাধনলব্ধ সম্পত্তি নহে, জন্মান্তরীণ সিদ্ধির উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত। এইরূপ সিদ্ধ-দিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি তে।—গীতা

* কেহ কেহ আসুরিকে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এবং পঞ্চশিখকে খৃষ্টপর প্রথম শতকে স্থাপন করিতে চান—এ মত ভিত্তিহীন।—'Asuri probably lived before 600 B. C.—if he be one with the Asuri of বৃহদারণ্যক, পঞ্চশিখ may be assigned to the 1st century A. D. (Garbe).

'এই মোক্ষজ্ঞান আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আমার সাধর্ম্য (সাধর্ম্য=সমান ধর্ম অর্থাৎ ব্রহ্মভাব) পাইয়াছেন, তাঁহারা সৃষ্টিতে উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়ে ব্যথিত হন না।' ইঁহাদিগকেই 'শিষ্ট' বলে। ইঁহারা পূর্বকল্পের অবশিষ্ট (Remnants)। আমরা জানি, সৃষ্টি প্রবাহরূপে অনাদি। এখন যে সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে, তাহার পূর্বে অনেকবার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পরেও অনেকবার সৃষ্টি হইবে। এক এক সৃষ্টির অবসানে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন সেই সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ জীবন্মুক্ত মহর্ষিগণ ব্রহ্মে নির্বাণ না লইয়া, জগতের হিতার্থে অবস্থান করেন। সেই জন্যই তাঁহাদিগকে 'শিষ্ট' বলে। শিষ্+ক্ত=শিষ্ট। এই শিষ্টদিগকে লক্ষ্য করিয়া মৎস্য-পুরাণকার বলিয়াছেন :—

মন্বন্তরস্যাতীতস্য স্মৃত্বা তন্ মনুরব্রবীৎ।
তস্মাৎ স্মার্তঃ স্মৃতো ধর্মো * * শিষ্টাচারঃ স উচ্যতে॥
শিষের্ধাতোশ্চ নিষ্ঠান্তাৎ শিষ্টশব্দং প্রচক্ষতে।
মন্বন্তরেষু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠন্তি ধার্মিকাঃ॥
মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব লোকসন্তানকারিণঃ।
তিষ্ঠন্তীহ চ ধর্মার্থং তান্ শিষ্টান্ সম্প্রচক্ষতে॥
শিষ্টৈরাচর্যতে যস্মাৎ পুনশ্চৈব যুগক্ষয়ে।
পূর্বৈঃ পূর্বৈর্মতত্বাচ্চ শিষ্টাচারঃ স শাশ্বতঃ॥—১৪৫ অধ্যায়

অর্থাৎ, 'কল্পের অবসানে যে ধার্মিকগণ 'অবশিষ্ট' থাকেন (মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি), যাঁহারা পরম্পরার বিচ্ছেদ বারণ করেন, যাঁহারা ধর্মার্থ পৃথিবীতে অবস্থান করেন,—তাঁহাদিগকে 'শিষ্ট' বলে। তাঁহাদের প্রবর্তিত যে আচার, তাহাই শিষ্টাচার।' কপিলদেব এইরূপ একজন 'শিষ্ট' সিদ্ধপুরুষ। তিনি জগতের হিতার্থে ব্রহ্মার ক্রিয়াশক্তি দ্বারা রচিত দেহ ধারণ করিয়া অতি প্রাচীনকালে সাংখ্যজ্ঞান প্রচার করেন। আদি-বিদ্বান্ তাঁহা হইতে শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে এই সাংখ্যজ্ঞানের প্রচার হয়।

'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'—যিনি পরমর্ষি, তিনি ঈশ্বরের সমানধর্মপ্রাপ্ত, ব্রহ্মভাবে ভাবিত। ঈশ্বরভাবাপন্ন সিদ্ধপুরুষকে ঈশ্বর বলা অসঙ্গত নহে—বরং সহজ ও স্বাভাবিক। অতএব কপিলদেব যে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষিত হইবেন, ইহা অপ্রত্যাশিত নহে। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন :—

তদিদং শাস্ত্রং কপিলমূর্ত্যা ভগবান্ বিষ্ণুরখিললোকহিতায় প্রকাশিতবান্।

'ভগবান্ বিষ্ণু অখিললোকহিতের জন্য কপিলমূর্তি ধারণ করিয়া এই শাস্ত্র প্রকাশ করেন।' মহাভারতেও এই ধরণের কথা আছে—

বাসুদেবেতি যং প্রাহুঃ কপিলং মুনিপুঙ্গবাঃ।

'মুনিগণ কপিলকে 'বাসুদেব' বলিয়া থাকেন।' *

রামায়ণেও আমরা কপিল ঋষির সাক্ষাৎ পাই। সেখানে তিনি সগর রাজার যজ্ঞীয় অশ্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সে আখ্যায়িকার সার মর্ম এই ;—সূর্যবংশীয় সগর রাজার দুই পত্নী ছিল, জ্যেষ্ঠার নাম কেশিনী ও কনিষ্ঠার নাম সুমতি। কেশিনীর গর্ভে রাজার অসমঞ্জ নামে একটি পুত্র ও সুমতির গর্ভে ষাট হাজার তনয় জন্মগ্রহণ করে। রাজা, অসমঞ্জকে পাপাচারী ও প্রজার অহিতকারী দেখিয়া, নির্বাসিত করেন। অংশুমান্ নামে তাহার এক পুত্র ছিল। ঐ পুত্র অতিশয় প্রিয়বাদী ও সকলের স্নেহের পাত্র হইয়া উঠে।

সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, অংশুমান্‌কে যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণ করিতে বলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞবিঘ্ন সম্পাদনের জন্য রাক্ষসী মূর্তি গ্রহণ করিয়া, সেই অশ্ব অপহরণ করিলেন। তখন উপাধ্যায়গণ সগরকে বলিলেন—'মহারাজ! আপনি অপহারককে সংহার করিয়া, শীঘ্র অশ্ব আনয়ন করুন। নতুবা আপনার ইষ্ট হইবে না।' তখন রাজা সগর

---

* এক স্থলে তাহাকে অগ্নির অবতার বলা হইয়াছে—অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্তক ইতি স্মৃতেঃ। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু এ মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—৬।৭০ সূত্রের ভিক্ষুভাষ্য।

সভামধ্যে ষষ্টিসহস্র পুত্রকে আহ্বানপূর্বক আদেশ করিলেন—'তোমরা এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরার সকল স্থানে তন্ন তন্ন করিয়া, অশ্বের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হও। যে পর্যন্ত সেই অশ্বাপহারকের দর্শন না পাও, তাবৎ এই পৃথিবী খনন কর'। সগর-সন্তানেরা তাহাই করিতে লাগিল।

ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা সাগরা প্রথিতাং দিশম্।
রোষাদভ্যখনন্ সর্বে পৃথিবীং সগরাত্মজাঃ॥
তে তু সর্বে মহাত্মানো ভীমবেগা মহাবলাঃ।
দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্॥
হয়ঞ্চ তস্য দেবস্য চরন্তম্ অবিদূরতঃ।—আদিকাণ্ড, ৪০।২৪-৬

সগরাত্মজেরা পূর্বোত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া পৃথিবী খনন করিতে লাগিল এবং তথায় কপিলরূপধারী সনাতন বাসুদেবকে নিরীক্ষণ করিল এবং দেখিল, তাঁহারই অদূরে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব বিচরণ করিতেছে। তাহারা কপিলকেই অশ্বাপহারক মনে করিয়া, 'তিষ্ঠ' 'তিষ্ঠ' বলিয়া তাঁহার দিকে ধাবমান হইল। কপিল তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাক্রোধে হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি হুঙ্কার করিবা-মাত্র সগর-সন্তানগণ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

শ্রুত্বা তদ্‌বচনং তেষাং কপিলো রঘুনন্দন!
রোষেণ মহতাবিষ্টো হুঙ্কারমকরোৎ তদা॥
ততস্তেনাপ্রমেয়েন কপিলেন মহাত্মনা।
ভস্মরাশীকৃতাঃ সর্বেঃ কাকুৎস্থ! সগরাত্মজাঃ॥
—আদিকাণ্ড, ৪০।২৯, ৩০

ইহার পর অংশুমান্ কপিলকে প্রসন্ন করিয়া, কিরূপে যজ্ঞীয় অশ্ব সগর-রাজার নিকট ফিরাইয়া আনেন এবং কিরূপে তিন পুরুষব্যাপী চেষ্টা ও তপস্যার ফলে গঙ্গাদেবী ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, পৃথিবীতে অবতরণ করতঃ ভস্মীভূত সগর-সন্তানগণকে উদ্ধার করেন—এ সকল কথা বর্তমান

প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনীয় নহে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেও কপিলের উল্লেখ আছে :—

যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
মহিষী মাধবস্যেষ্টা স এষ ভগবান্ প্রভুঃ।
কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্॥

মহাভারতের বনপর্বে সগর রাজার যজ্ঞীয় অশ্বের সম্পর্কে আমরা কপিলের যে বিবরণ প্রাপ্ত হই, সে বিবরণ রামায়ণের বিবরণেরই অনুরূপ।

ততঃ পূর্বোত্তরে দেশে সমুদ্রস্য মহীপতে!
বিদার্য পাতালমথ সংক্রুদ্ধাঃ সগরাত্মজাঃ॥
অপশ্যন্ত হয়ং তত্র বিচরন্তং মহীতলে।
কপিলং চ মহাত্মানং তেজোরাশিমনুত্তমম্।
তেজসা দীপ্যমানং তু জ্বালাভিরিব পাবকম্॥—৯৩।৫৩-৫৫

'সমুদ্রের পূর্বোত্তর দেশে পাতাল বিদারণ করিলে, ক্রুদ্ধ সগর-সন্তানগণ সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইল এবং জ্বালা-সমাকুল অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান তেজঃপুঞ্জ মহাত্মা কপিলকে দর্শন করিল।' তখন কাল-প্রেরিত সগর-সন্তানগণ মহাত্মা কপিলকে অনাদর করিয়া, অশ্বগ্রহণ-মানসে ধাবিত হইল।

ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ কপিলো মুনিসত্তমঃ।
বাসুদেবেতি যং প্রাহুঃ কপিলং মুনিপুঙ্গবম্॥
স চক্ষুর্বিকৃতং কৃত্বা তেজস্তেষু সমুৎসৃজন্।
দদাহ সুমহাতেজা মন্দবুদ্ধীন্ স সাগরান্॥—৯৩।৫৭-৮

'তখন মুনিসত্তম কপিল (যাঁহাকে বাসুদেব বলা হয়) ক্রুদ্ধ হইয়া, চক্ষু বিকৃত করতঃ, তাহাদের উপর তেজোবর্ষণ করিলেন এবং সেই মন্দবুদ্ধি সগর-সন্তানগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।'

রামায়ণ ও মহাভারতে সগর-সন্তানগণের সম্পর্কে আমরা মুনিপুঙ্গব কপিলের যে বিবরণ প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে তিনি যে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক বা সাংখ্যজ্ঞানের প্রচারক, তাহার কোন উল্লেখ পাইলাম না। তবে মহাভারতের অন্যত্র কপিলঋষি যে সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা, তাহার উল্লেখ আছে—

সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ পুরাতনঃ।—শান্তিপর্ব

এবং তৎশিষ্য-প্রশিষ্য আসুরি ও পঞ্চশিখের নামোল্লেখ আছে—

আসুরির্মণ্ডলে তস্মিন্ প্রতিপেদে তদব্যয়ং।
তস্য পঞ্চশিখঃ শিষ্যো মানুষ্যপয়সাভৃতঃ॥

শান্তিপর্বে মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়ে সাংখ্যমতের সবিশেষ বিবরণ আছে; সে বিষয়ের এখানে আলোচনা করিব না। এখানে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রামায়ণ ও মহাভারত উভয় গ্রন্থেই কপিলকে বাসুদেব বলা হইল। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে—যেখানে ভগবানের অবতার-সমূহের গণনা আছে, তাহার মধ্যে আমরা কপিলের উল্লেখ পাই।

পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্॥—ভাগ, ১।৩।১০

[এই অবতারগণ পরমপুরুষের অংশকলা—এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ]

অবতার-গণনায় কপিল পঞ্চম অবতার, সিদ্ধগণের অগ্রণী—তিনি কালবিপ্লুত সাংখ্যজ্ঞান আসুরিকে উপদেশ করিয়াছিলেন। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে (২৫ হইতে ৩৩ অধ্যায়ে) প্রসিদ্ধ দেবহূতি-কপিল-সংবাদ। সেখানে কপিলদেবের যে বিবরণ আছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি কর্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

কপিলঃ তত্ত্বসংখ্যাতা ভগবান্ আত্মমায়য়া।
জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাৎ আত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্॥—ভাগ, ৩।২৫।১

'অজ (জন্মরহিত) ভগবান্ জীবকে আত্মজ্ঞান দিবার জন্য, নিজ মায়া দ্বারা তত্ত্বসংখ্যাতা কপিলরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন' এবং যথাকালে জননী

দেবহূতির অজ্ঞান অপনোদন জন্য, তাঁহার নিকট সেই সাংখ্যজ্ঞান উপদেশ করিলেন।

তত্ত্বাম্নায়ং যৎ প্রবদন্তি সাংখ্যং
প্রোবাচ বৈ ভক্তিবিতানযোগম্।—ভাগ, ৩।২৫।৩১

ভাগবতে সাংখ্যমত যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহার সহিত প্রচলিত সাংখ্যমতের কয়েক বিষয়ে মর্মান্তিক প্রভেদ আছে। এ স্থানে তাহা আলোচ্য নহে। এখানে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে কপিলদেবের যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই সঙ্কলন করিলাম মাত্র।

পঞ্চম অধ্যায়

সাংখ্যীয় দুঃখবাদ

সাংখ্যশাস্ত্রের আরম্ভ দুঃখবাদে--পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা যাহাকে Pessimism বলেন। এ বাদের মুখ্য কথা এই, জগৎ দুঃখময়। জগতে সুখ আদৌ নাই, তাহা নহে; তবে সুখ অত্যল্প,—দুঃখই বেশী। দুঃখবাদের বিপরীত মতকে Optimism (শুভবাদ বা সুখবাদ) বলে। শুভবাদীরা বলেন, জগতে দুঃখ আছে বটে; কিন্তু সুখের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। এক পক্ষে সার্ জন্ লাবাক্-এর (Sir John Lubback) মত লোক জীবনের সুখরাশির (Pleasures of Life) গণনা করিতেছেন; অন্যপক্ষে সোপেন্‌হয়ার্ (Shopenhauer) এবং হার্টম্যান্ (Hartman) বলিতেছেন যে, জীবন-দীপের নির্বাণই শ্রেয়স্কর। এ দেশের দার্শনিকদিগের মধ্যে চার্বাক্‌কে সুখবাদী বলিতে পারা যায়। চার্বাক্-দর্শন বলেন যে, জগতে দুঃখ আছে বটে, কিন্তু দুঃখের ভয়ে সুখকে আলিঙ্গন না করা মূঢ়তা। পুষ্পে কীট থাকে বলিয়া, আমরা কি পুষ্পের আঘ্রাণ লইব না?

সে যা' হ'ক, সাংখ্যেরা কিন্তু নিপট দুঃখবাদী—তাঁহারা বলেন, দুঃখই জগতের স্বভাব। এ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকা লিখিয়াছেন—

> তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
> লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তে স্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন ॥—কারিকা, ৫৫

'জীব যতদিন শরীর ধারণ করে, ততদিন তাহাকে জরা-মরণ জন্য দুঃখ ভোগ করিতেই হয়; অতএব দুঃখ-ভোগ জীবের স্বভাব।'*

---

* Pain is the fundamental fact in life. Wherever life is, there is pain.—Canon Street's Reality, p 57.

সাংখ্যেরা বলেন, জগতে সুখ আদৌ নাই,—তাহা নয়; তবে সুখ কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে মিলে। সে সুখও আবার অতি অল্প ও দুঃখ-সংভিন্ন। তাহাও আবার স্থায়ী হয় না। অতএব সে সুখ দুঃখপক্ষেই ধর্ত্তব্য। তাই সূত্রকার বলিয়াছেন—

কুত্রাঽপি কোঽপি সুখীতি। তদপি দুঃখশবলম্ ইতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ।—সাংখ্যসূত্র, ৬।৭-৮

অন্যত্র সূত্রকার বলিতেছেন—

সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্—৩।৫৩

ঊর্দ্ধাধো-গতানাং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানাং সর্ব্বেষামেব জরামরণাদিজং দুঃখং সাধারণম্—বিজ্ঞান ভিক্ষু।

উচ্চ নীচ, ঊর্দ্ধ অধঃ—সকলেরই দুঃখ সাধারণ (common property)। সাংখ্যমতানুযায়ী পাতঞ্জল-দর্শন এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন—

দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ* —২।১৫

হেয়ং দুঃখম্ অনাগতম্—২।১৬

---

* বিবেকিনঃ ন তু সংসারিণঃ। যাহারা স্থূলদর্শী, সংসারী,—তাহারা হয় ত' দুঃখোদর্ক সুখকে সুখ ভাবিয়া বহুমান করিতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বিবেকীর চক্ষে সে সুখ দুঃখেরই পূর্ব্বরূপ—অতএব হেয়। সেইজন্য ব্যাসভাষ্য বলিতেছেন—অক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনঃ ক্লিশ্নাতি। বিবেকী যোগীর চিত্ত অক্ষিপাত্রের ন্যায় সুকুমার। চোকের পাতায় এতটুকু কুটা পড়িলে, সহ্য হয় না; কিন্তু মানুষ পিঠের উপর কিল চড় সহিতে পারে। উট কাঁটা ঘাস স্বচ্ছন্দে খায়, কিন্তু তাহাতে আমাদের জিহ্বা ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। সেইজন্য ২।১৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—বিষয়সুখকালেঽপি দুঃখম্ অস্ত্যেব প্রতিকূলাত্মকং যোগিনঃ। কেন? পতঞ্জলি ২।১৫ সূত্রে ইহার উত্তর দিয়াছেন—'পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।' ইহার বৃত্তি করিয়া ভোজদেব বলিতেছেন—ঐকান্তিকীং আত্যন্তিকীঞ্চ দুঃখনিবৃত্তিং ইচ্ছতো বিবেকিন উক্তরূপকারণচতুষ্টয়াৎ সর্ব্বে বিষয়া দুঃখরূপতয়া প্রতিভান্তি। অর্থাৎ, বিষয়ের ভোগকালে তৎপ্রতি আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত

যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যের এক স্থলে জৈগীষব্য ঋষির এক আখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে। জৈগীষব্য নামে দশমহাকল্পজীবী এক জাতিস্মর মহর্ষি ছিলেন। তাঁহাকে একদিন আবট্য ঋষি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আপনি ত' এই সুদীর্ঘ কালে অশেষবিধ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া, অশেষ প্রকারের ভোগ উপলব্ধি করিয়াছেন। আপনার উপলব্ধির সার মর্ম কি?" ইহার উত্তরে মহর্ষি জৈগীষব্য বলিয়াছিলেন:—"আমার অভিজ্ঞতার সার মর্ম দুঃখ। যত যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছি, যত ভোগ উপলব্ধি করিয়াছি, তাহার মূলে দুঃখ।" *

অন্যান্য ভারতীয় দর্শনেও এই দুঃখবাদের সমর্থন দেখা যায়। ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র এইরূপ –

দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তিদোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াৎ অপবর্গঃ।—ন্যায়সূত্র, ১।১।২

হয়, অথচ ভোগদ্বারা সে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ঘটে না—ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি—ইহাই পরিণাম-দুঃখ। ভোগকালে ভোগের পরিপন্থী বিষয়ে স্বতঃই দ্বেষ উৎপন্ন হয়—ইহাই তাপ-দুঃখ। ভোগমাত্রেরই—তা' সে ভোগ সুখকর হো'ক বা দুঃখকর হো'ক—একটা সংস্কার চিত্তে নিরূঢ় হইয়া যায়, এবং তাহার ফলস্বরূপ যে ভাবী দুঃখ—তাহাই সংস্কার-দুঃখ। ইহা ছাড়া সমস্ত চিত্তবৃত্তি যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমের দ্বারা অনুবিদ্ধ—অতএব যুগপৎ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, তখন কোন ভোগই দুঃখানুবিদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। উক্ত কারণ-চতুষ্টয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিবেকী ব্যক্তি বিষয়-জনিত সুখভোগ কালেও তাহার দুঃখাত্মকতা অনুভব করেন। তাই বলা হইল—দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।

* অথ ভগবান্ আবট্য তনুধরঃ তমুবাচ—দশসু মহাসর্গেষু ভব্যত্বাৎ অনভিভূত-বুদ্ধিসত্ত্বেন ত্বয়া দেবমনুষ্যেষু পুনঃ পুনঃ উৎপদ্যমানেন সুখদুঃখয়োঃ কিম্ অধিকম্ উপলব্ধমিতি। ভগবন্তমাবট্যং জৈগীষব্য উবাচ—দেবমনুষ্যেষু পুনঃ পুনঃ উৎপদ্যমানেন যৎকিঞ্চিদ্ অনুভূতং তৎ সর্বং দুঃখমেব প্রত্যবৈমি।—৩।১৮ সূত্রের ব্যাসভাষ্য

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ন্যায়দর্শনের মতেও সংসার দুঃখময়। নৈয়ায়িকের মতে সুখমাত্রেই দুঃখানুষক্ত; অতএব গৌণরূপে সুখকেও দুঃখ বলিয়া গণ্য করা উচিত। জন্মিলেই দুঃখ। যদি দুঃখের নাশ করিতে হয়, তবে জন্মের বারণ করিতে হইবে। সেইজন্য ন্যায়দর্শন জন্মের হেতু-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, কিরূপে জন্মের এবং তাহার চির-সহচর দুঃখের বারণ হইতে পারে, তাহারই উপায়-উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বৈশেষিক দর্শনের মতেও সংসার দুঃখময়। সেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই নিঃশ্রেয়স।

নিঃশ্রেয়সম্ আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ—শঙ্কর মিশ্র-কৃত বৈশেষিক সূত্রোপস্কার, ১।১।২

সকলেই অবগত আছেন, পূর্বমীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য—যজ্ঞ।

স্বর্গকামো যজেত—'স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।' কারণ, যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। স্বর্গ সুখধাম, সেখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই; সেখানে চাহিলেই সুখ মিলে।

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তম্ অনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্॥

'যে সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরে দুঃখে পরিণত হয় না, যে সুখ ইচ্ছামাত্র উপস্থিত হয়, স্বর্গ বলিতে সেই সুখ বুঝায়।' সংসার দুঃখালয়—স্বর্গ সুখধাম। এই দুঃখময় সংসার ছাড়িয়া জীব যাহাতে সুখময় স্বর্গের অধিকারী হইতে পারে, ইহাই মীমাংসা-দর্শনের উদ্দেশ্য। অতএব এ মতেও সংসার দুঃখময়।

ষড়্দর্শনের শেষ দর্শন উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। বেদান্তদর্শনেরও ভিত্তি দুঃখবাদ,—বেদান্তদর্শনের মতেও সংসার দুঃখময়। শঙ্করাচার্য সংসারকে উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল আবর্তবহুল নক্র-কুম্ভীর-ভীষণ সমুদ্রের সহিত

তুলনা করিয়াছেন। এই সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে জীব সর্বদাই সন্ত্রস্ত হইতেছে। বেদান্তসার বলিতেছেন —

অয়ম্ অধিকারী জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তোদ্দীপ্তশিরা জলরাশিমিব উপহার পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুম্ উপসৃত্য তমনুসরতি।—১১

অর্থাৎ, যাহার শিরে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, সে যেমন ব্যাকুল হইয়া জলরাশির অন্বেষণ করে, সংসারানল-তাপিত অধিকারী পুরুষও সেইরূপ সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করেন।

বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্র, "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"--"অনন্তর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।" কিসের অনন্তর? সংসাররূপ দাবদহনে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইয়া চিত্তে বৈরাগ্য ও সংসার হইতে মোক্ষেচ্ছা উদয় হইবার অনন্তর। কারণ, সংসার দুঃখালয়, অনিত্য, অসুখ। গীতা বলিতেছেন—দুঃখালয়মশাশ্বতম্—অনিত্যম্ অসুখং লোকম্। অতএব বেদান্তদর্শনেরও আরম্ভ দুঃখবাদে।

সাংখ্যের দুঃখবাদে ও বেদান্তের দুঃখবাদে বেশ একটু প্রভেদ আছে—তাহা আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। বেদান্তো নাম উপনিষদ্—উপনিষদ্‌ই প্রকৃত বেদান্ত। এই উপনিষদ্ বলিতেছেন—অতোঽন্যৎ আর্তম্—সুখস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু, সমস্তই আর্ত (দুঃখময়)। কারণ, অমৃতের পুত্র জীবের মধ্যে অদম্য ব্রহ্মক্ষুধা (hunger for the Absolute) সর্বক্ষণ সন্ধুক্ষিত হইতেছে। সেইজন্য জীব ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সহিত সমস্বরে বলে—যেনাহং নামৃতা স্যাং তেন কিং কুর্যাম্—'যাহার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না, তাহা লইয়া আমি কি করিব?' সেইজন্য জীবের যুগব্যাপী অভিজ্ঞতা এই যে, ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ—বিত্ত (Possessions) দ্বারা মানুষের কখনও তৃপ্তি হয় না, হইতে পারে না; কারণ, অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন—'বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা কোথায়?' সেইজন্য ঋষিবালক নচিকেতাকে যম রাজ্য, ঐশ্বর্য, ইন্দ্রিয়ভোগ প্রভৃতি নানা প্রলোভনে প্রলোভিত করিলে—মহাভূমো নচিকেত ঋমেধি

—ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা ইত্যাদি—নচিকেতা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন—'শ্বোভাবা মর্ত্যস্য'—এ সকলই ত' নশ্বর—অমৃতের পুত্র আমি—ভঙ্গুর ভোগে আমার কি হইবে ? উপনিষদ্ আরও বলিতেছেন যে, বিরস বিষয়-ভোগে আমরা যে ক্ষণিক সুখের আস্বাদ পাই, তাহার কারণ এই যে, সমস্ত বস্তুর মধ্যে সুখস্বরূপ যে ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন আছেন, বিষয়ের সংস্পর্শকালে আমরা তাঁহাকেই স্পর্শ করি এবং সেইজন্যই বিষয়ে সুখ হয়। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রাম্ উপজীবন্তি—বৃহ. ৪।৩।৩২

'সমস্ত ভূত সেই আনন্দময়ের কণিকা হইয়া জীবিত আছে।' তিনি রসস্বরূপ, আনন্দময়। বিষয়ের মধ্যে, ভোগ্যবস্তুর মধ্যে, তাঁহার রসের যে কণা প্রচ্ছন্ন আছে, জীব তাহারই আস্বাদ করিয়া আনন্দী হয়।

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি—তৈত্তি, ২।৪।৭

সেইজন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

অতঃ অন্যৎ আর্ত্তম্।

শুধু হিন্দু-দর্শন নহে, বৌদ্ধ-দর্শনেরও ঐ সুর। তাহারও ভিত্তি দুঃখবাদ। বস্তুতঃ বুদ্ধদেব বোধিদ্রুমতলে সম্বোধি-লাভের পর যে আর্য-সত্যচতুষ্টয় প্রচার করিয়াছিলেন—'দুক্‌খ, দুক্‌খ-সমুপ্‌পাদ, দুক্‌খাতিক্কম, দুক্‌খোপসমগামী মগ্‌গ'* —যাহা সমস্ত বৌদ্ধ-শিক্ষার মূল এবং সমস্ত বৌদ্ধ-

---

* এই পালি শব্দচতুষ্টয়ের সংস্কৃত প্রতিশব্দ এই :—দুঃখ, দুঃখ-সমুৎপাদ (দুঃখের নিদান), দুঃখাতিক্রম (দুঃখের অতিক্রম বা নিরোধ) এবং দুঃখোপশমগামী মার্গ (দুঃখ-নিরোধের উপায়)। বুদ্ধদেবের প্রচারিত এই আর্য-সত্য-চতুষ্টয়ের সহিত পাতঞ্জল দর্শনের হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়—এই পদার্থ-চতুষ্টয়ের বেশ সাদৃশ্য আছে। যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র চতুর্ব্যূহ—রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য—সেইরূপ যোগশাস্ত্রও চতুর্ব্যূহ—সংসার, সংসারহেতু, মোক্ষ ও মোক্ষোপায়। এ সম্বন্ধে ব্যাসভাষ্য বলিতেছেন—যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং—রোগঃ, রোগহেতুঃ,

দর্শনের ভিত্তি,—তাহার প্রথম কথাই দুঃখ, অর্থাৎ সংসার দুঃখময়, জগৎ দুঃখালয় এবং ঐ দুঃখের নিদান অনুসন্ধান করিয়া তাহার অতিক্রমের উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক।

অতএব সাংখ্যোক্ত দুঃখবাদ সমস্ত ভারতীয় দর্শনেরই অনুমোদিত। সাংখ্যগ্রন্থে দুঃখবাদ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত দেখা যায়—

কাকমাংসং শুনোচ্ছিষ্টং স্বল্পং তদপি দুর্লভম্।

জগতের সুখ কাকমাংসের সহিত তুলনীয়। কাকমাংস স্বভাবতঃই তিক্ত ও বিস্বাদ। সেই মাংস যদি কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট হয়, তবে খাইতে কেমন হয়? আবার সেই উচ্ছিষ্ট মাংস যদি পরিমাণে অত্যল্প হয়, অর্থাৎ, তাহার কষ্টসাধ্য ভোজনে উদরের পূর্তির যদি না সম্ভাবনা থাকে এবং চেষ্টা করিয়াও যদি সেই মাংসের সন্ধান না মিলে, তবে ভোজনকারীর যে অবস্থা হয়, সুখের সম্বন্ধে মানুষেরও সেই অবস্থা।

সাংখ্যেরা বলেন,—দুঃখময় জগতের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, দুঃখ ত্রিবিধ।

অধ্যাত্মম্ অধিভূতম্ অধিদৈবঞ্চ—তত্ত্বসমাস, ৭

সেইজন্য কারিকা বলিতেছেন—

দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ—১

সূত্রকারের গণনাও ঐরূপ—

অথ ত্রিবিধ-দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিঃ—১।১

এই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখই শিবের ত্রি-শূল। এই ত্রিশূলের আঘাতে জীব অহরহঃ পীড়িত হইতেছে।

আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক।

আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি এবম্ ইদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব। তদ্ যথা সংসারঃ সংসার-হেতুঃ মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ। প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগঃ হেয়হেতুঃ। সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং। হানোপায়ঃ সম্যগ্ দর্শনম্।

শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মবিপর্যয়কৃতং জ্বরাতিসারাদি। মানসং প্রিয়-বিয়োগাপ্রিয়সংযোগাদি—গৌড়পাদ।

ধাতুবিপর্যয়জনিত জ্বরাদি পীড়া শারীর দুঃখ এবং প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়-সংযোগজনিত দুঃখ মানসদুঃখ।

অন্য ভূত বা প্রাণী হইতে উৎপন্ন দুঃখ আধিভৌতিক দুঃখ এবং শীতোষ্ণ -বাতবর্ষাদি জনিত দুঃখ আধিদৈবিক দুঃখ।

আধিভৌতিকং চতুর্বিধং ভূতগ্রামনিমিত্তং মনুষ্যপশুমৃগপক্ষিসরীসৃপদংশ-মশক-যূকা-মৎকুণ-মৎস্য-মকর-গ্রাহ-স্থাবরেভ্যো জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জেভ্যঃ সকাশাদুপজায়তে॥ আধিদৈবিকং। দেবানামিদং দৈবিকং। দিবঃ প্রভব-তীতি বা দৈবং। তদধিকৃত্য যদুপজায়তে শীতোষ্ণবাতবর্ষাশনিপাতাদিকম্॥

আধিভৌতিক দুঃখ চতুর্বিধ ; কারণ, ঐ দুঃখ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্বিধ ভূত হইতে উৎপন্ন হয়। যে দুঃখের মূল দেবতা অথবা দৈব হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাই আধিদৈবিক দুঃখ–শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষণ, বজ্রাঘাত প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন। এ বিষয়ে অনিরুদ্ধ আর একটু সূক্ষ্ম করিয়া বলেন—দুঃখ একবিংশতি প্রকার। তথাহি হেয়ং দুঃখমনাগতম্ একবিংশতি-প্রকারং—শরীরং, ষড়িন্দ্রিয়াণি, ষড়্ বিষয়াঃ, ষড়্ বুদ্ধয়ঃ, সুখং দুঃখঞ্চেতি। তত্র শরীরং দুঃখায়তনত্বাৎ দুঃখং ইন্দ্রিয়াণি, বিষয়া বুদ্ধয়শ্চ তৎসাধনভাবাদ্দুঃখং, সুখং দুঃখানুষঙ্গাৎ, দুঃখং যাতনাপীড়াসন্তাপাত্মকং মুখ্যত এবেতি। অর্থাৎ, শরীর, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনঃ—এই ছয় ইন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ঐ ছয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ছয় বুদ্ধি এবং সুখ ও দুঃখ—দুঃখের এই একবিংশতি প্রকার ভেদ। শরীর যখন দুঃখের আয়তন, তখন ত' দুঃখ বটেই। ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বুদ্ধি যখন শরীরের সাধন—তখন তাহারা অবশ্যই দুঃখাত্মক। সুখও দুঃখ—যেহেতু তাহা দুঃখানুষক্ত ; আর দুঃখ ত' দুঃখ বটেই, যেহেতু তাহা যাতনা, পীড়া ও সন্তাপকর।

সে যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে দুঃখ আমাদের উপাদেয় নহে—হেয় ; আমরা দুঃখ চাই না, দুঃখনিবৃত্তি চাই। সেইজন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

অথ ত্রিবিধ-দুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্ত-পুরুষার্থঃ—১।১

অত্যন্তদুঃখ-নিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা—৬।৫

জীব তখনই কৃতকৃত্য হয়, যখন তাহার অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হয়—কারণ, দুঃখনিবৃত্তিই জীবের পুরুষার্থ।

কারিকা ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদভিঘাতকে হেতৌ—১

জীব ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাতে পীড়িত হইয়া দুঃখহানির উপায় অনুসন্ধান করে এবং সেই উপায় আয়ত্ত করিতে পারিলে, তবেই কৃতকৃত্য হয়। তাই তত্ত্বসমাস বলিতেছেন—এতৎ সম্যক্ জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ স্যাৎ ন পুনস্ত্রিবিধেন দুঃখেনাভিভূয়তে।

দুঃখহানির উপায়-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া মানুষ দেখে যে, দুঃখনিবৃত্তির জন্য সাধারণতঃ সে দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পারে—প্রথম দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় এবং দ্বিতীয় অদৃষ্ট বা বৈদিক উপায়। লৌকিক উপায় ঔষধ সেবন দ্বারা সে শারীরিক দুঃখের এবং ইষ্টসাধন দ্বারা সে মানসিক দুঃখের নিবৃত্তি করিতে পারে বটে। এইরূপ, সশস্ত্র হইয়া এবং সাঁজোয়া পরিয়া সে ব্যাঘ্রবৃকাদির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে এবং ঊর্ণাবস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া শীত এবং ছত্রাদি ধারণ করিয়া বাত-বর্ষার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে বটে ; কিন্তু এই সকল লৌকিক উপায় দ্বারা যে দুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহা সাময়িক মাত্র—আত্যন্তিক নিবৃত্তি নহে। আজ পরিপাটি ভোজন করিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবারণ করিলাম বটে, কিন্তু কাল ? আবার ক্ষুৎপিপাসার অভিঘাত সহিতে হইবে। সেইজন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিঃ নিবৃত্তেঽপি অনুবৃত্তিদর্শনাৎ—১।২

আরও দেখা যায়, শুধু যে এই সব লৌকিক উপায়ের ফল অস্থায়ী, তাহা নহে—সেই সকল উপায় আবার অব্যভিচারীও (unfailing) নহে। আজ কুইনাইন-সেবনে জ্বর ত্যাগ হইল, কিন্তু অন্য সময়ে ১০০ গ্রেণেও বিজ্বর হইল না। সেইজন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

সর্বাসম্ভবাৎ তৎসম্ভবেঽপি অত্যন্তাসম্ভবাৎ হেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ—১।৪

কারিকা এই কথার নিষ্কর্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

দৃষ্টে সাপার্থা চেৎ ন একান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ—কা, ১

অতএব, দুঃখনিবৃত্তির দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় যখন ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নহে, তখন তদ্দ্বারা দুঃখনিবৃত্তির আশা দুরাশামাত্র।

দুঃখনিবৃত্তির যে অদৃষ্ট বা বৈদিক উপায় অর্থাৎ, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও পর্যাপ্ত নহে। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের ফলে যজমান সুখধাম স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু তথাপি এ উপায় সদুপায় নহে। কারণ, উহা ত্রিবিধদোষ-দুষ্ট।

দৃষ্টবদ্ আনুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ—কারিকা, ২

'লৌকিক উপায়ের ন্যায়, আনুশ্রবিক বা বৈদিক উপায়ও পর্যাপ্ত নহে। অধিকন্তু উহাতে ত্রিবিধ দোষ আছে—অতিশয়, অবিশুদ্ধি ও অস্থায়িত্ব।' কর্মের তারতম্য-অনুসারে অর্জিত স্বর্গলোকেরও তারতম্য বা অতিশয় ঘটে। তাহার ফলে কেহ উচ্চতর, কেহ নিম্নতর স্বর্গের অধিকারী হয়। তাহাতে পরস্পরের উৎকর্ষ-অপকর্ষের ভেদ-দর্শনে স্বর্গবাসীর দুঃখানুভব অপরিহার্য। দ্বিতীয় কথা, যজ্ঞসাধনের জন্য যাজ্ঞিককে অবশ্যই জীবহিংসা করিতে হয়। অতএব, হিংসাবহুল যজ্ঞানুষ্ঠানে যেমন পুণ্য আছে, তেমনি পাপের স্পর্শও সুনিশ্চিত। আর সেই পাপের ফলে দুঃখভোগ অনিবার্য। কিন্তু বৈদিক উপায়ের মারাত্মক ত্রুটি এই যে, যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহার ভোগ স্থায়ী হয় না। কর্মবাদীরা যে বলেন—অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্য-যাজিনো ফলং ভবতি—চাতুর্মাস্য-যাগকারীর অক্ষয় ফল হয়—ইহা অর্থবাদ-

মাত্র! কর্মবাদীরা বলেন বটে—অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম যজ্ঞীয় সোম পান করিলে অমৃতত্ব লাভ হয়—কিন্তু সে অমৃতত্ব আপেক্ষিক অমৃতত্ব—চিরস্থায়ী নয়। আভূতসংপ্লবং স্থানম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে—'প্রলয়াবধি স্থিতিকে অমৃতত্ব বলা যায়।' পুণ্যকর্মের ফলভোগান্তে কর্মীর পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব কর্মীকে আবার দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। সেইজন্য সাংখ্যাচার্যেরা বলেন যে, দুঃখনিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক উপায় যেমন যথেষ্ট নহে, তেমনি বৈদিক উপায়ও যথেষ্ট নহে।

অবিশেষশ্চোভয়োঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৬

সূত্রকার আরও বলিতেছেন—

নানুশ্রবিকাদ্ অপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যত্বেনাবৃত্তিযোগাদ্ অপুরুষার্থত্বম্—১।৮২

'বৈদিক উপায় যজ্ঞাদির দ্বারা তাহার সিদ্ধি সম্ভবপর নহে; কারণ, যাহা কর্মসাধ্য, তাহা অস্থায়ী—তাহার ফলে আবৃত্তি (পুনর্জন্ম) অবশ্যম্ভাবী।' দেখ, দুঃখাৎ দুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ—১।৮৪

—জলসেকের দ্বারা শীত-নিবারণের আশা যেমন দুরাশা, এই সকল উপায় দ্বারা দুঃখনিবৃত্তির আশাও তদ্রূপ।

তবে দুঃখনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় কি? যে উপায় অবলম্বন করিলে, দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি হইবে? সেই উপায়নির্দ্ধারণের জন্যই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তনা।

সাংখ্যাচার্যদিগের মতে দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়—জ্ঞান।

জ্ঞানাৎ মুক্তি—সাংখ্যসূত্র, ৩।২৩

জ্ঞানেন চাপবর্গঃ—কারিকা, ৪৪

কিসের জ্ঞান? ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ—কারিকা, ২

প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান বা অন্যতা-খ্যাতি—সাংখ্য-পরিভাষায় যাহাকে 'বিবেকখ্যাতি' বলে।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ—যোগসূত্র, ২।২৬

'নিশ্চল বা অবিপ্লব বিবেকখ্যাতিই দুঃখহানির একমাত্র উপায়।'*

বিবেকাৎ নিঃশেষ-দুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরাৎ নেতরাৎ

—সাংখ্যসূত্র, ৩।৮৪

'বিবেক হইতেই নিঃশেষে দুঃখনিবৃত্তি—তাহারই ফলে জীব কৃতকৃত্য হয়—বিবেক হইতেই হয়, অন্য কিছু হইতে নহে, অন্য কিছু হইতে নহে।' কারিকা বলিতেছেন—

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।

অবিপর্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলম্ উৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥—সাংখ্যকারিকা, ৬৪

'এইরূপ তত্ত্বের পুনঃ পুনঃ চর্চা করিলে, সংশয় ও ভ্রম-রহিত, বিশুদ্ধ, বিমল, নিঃশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।' তাহার ফলে, জীব জীবন্মুক্তির অধিকারী হইয়া প্রারব্ধকর্মের ক্ষয় পর্যন্ত দেহ ধারণ করিয়া থাকে। সে অবস্থায় জীব বুঝিতে পারে যে, আমি কর্তা নই, ভোক্তা নই; আমার কোনও কিছু ব্যাপার নাই।

সেইরূপ নিঃসঙ্গ নিরহঙ্কার ব্যক্তির পক্ষে ধর্মাধর্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ, ধর্মাধর্ম আর জন্মাদিরূপ ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। বাচস্পতি-মিশ্র বলিয়াছেন—

ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্মবীজান্যঙ্কুরং প্রসুবতে, তত্ত্বজ্ঞান-নিদাঘনিপীত-সকলসলিলায়াম্ ঊষরায়াং কুতঃ কর্মবীজানাম্ অঙ্কুরপ্রসবঃ॥

'জলসিক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; প্রখর সূর্যকরে যদি কোন ক্ষেত্রের সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়া যায়, তবে সে ঊষর ভূমিতে কি আর অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে? অজ্ঞান-সিক্ত বুদ্ধিতেই সঞ্চিতকর্ম ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়; কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত অবিবেক অপনীত করিয়া চিত্তকে ঊষর করিয়া ফেলে, তখন সে ক্ষেত্রে আর কর্মবীজ অঙ্কুরিত হইবে কিরূপে?'

---

* তচ্চ (কৈবল্যং) সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিনিবন্ধনম্—তত্ত্বকৌমুদী, ২১

এইরূপ বিবেকীকে লক্ষ্য করিয়া কারিকায় উক্ত হইয়াছে—

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ।

ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি ॥—সাংখ্যকারিকা, ৬৮

'তাঁহার শরীরের নাশ হইলে প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায়, তিনি ঐকান্তিক (অবশ্যম্ভাবী) ও আত্যন্তিক (অবিনাশী) কৈবল্য (দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি) লাভ করেন।'

জীবকে এই কৈবল্যের অধিকারী করাই সাংখ্যশাস্ত্রের লক্ষ্য। সাংখ্যাচার্যেরা বলেন যে, অণিমাদি ঐশ্বর্যলাভ বা বিভূতিযোগ জীবের পুরুষার্থ (summum bonum) নহে—

ন ভূতিযোগেঽপি কৃতকৃত্যতা উপাস্যসিদ্ধিবৎ—সাংখ্যসূত্র, ৪।৩২

সত্ত্ববিশাল ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তিও জীবের পুরুষার্থ নহে। কারণ, সেখান হইতেও সংসারে আবার আবৃত্তি হইয়া থাকে—

আবৃত্তিঃ তত্রাপি উত্তরোত্তর-যোনিযোগাদ্ হেয়ঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫২

প্রকৃতিলয়ও জীবের পুরুষার্থ নহে। কারণ, মগ্নের পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী—

ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা, মগ্নবদ্ উত্থানাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৪

তবে পুরুষার্থ কি? সূত্রকার দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ—৬।৭০

'ত্রিবিধ দুঃখের উচ্ছেদ বা অত্যন্ত নিবৃত্তি—ইহাই পুরুষার্থ, ইহাই পুরুষার্থ।'

আমরা দেখিলাম, পুরুষ-প্রকৃতির বিবেকই এই দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়—কারণ, সাংখ্যমতে প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেকই বন্ধহেতু এবং তয়োর্বিবেক এব মোক্ষহেতুঃ (ভিক্ষু, ১।৫৭)। এই মোক্ষই উৎকর্ষের চরম—উহাই নিঃশ্রেয়স।

উৎকর্ষাৎ অপি মোক্ষস্য সর্বোৎকর্ষশ্রুতে।—১।৫

মোক্ষস্তু সর্বোৎকৃষ্টঃ নিত্যত্বাৎ একত্বাৎ সর্বদুঃখোচ্ছেদকরূপত্বাৎ—অনিরুদ্ধ।

দৃষ্ট-সাধন-জন্য লাভের অপেক্ষা, অদৃষ্ট-সাধন-জন্য মোক্ষের উৎকর্ষ অবশ্যই সমধিক—কারণ, মোক্ষে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি। অতএব ইহাই প্রকৃত পুরুষার্থ—যথা তথা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ।